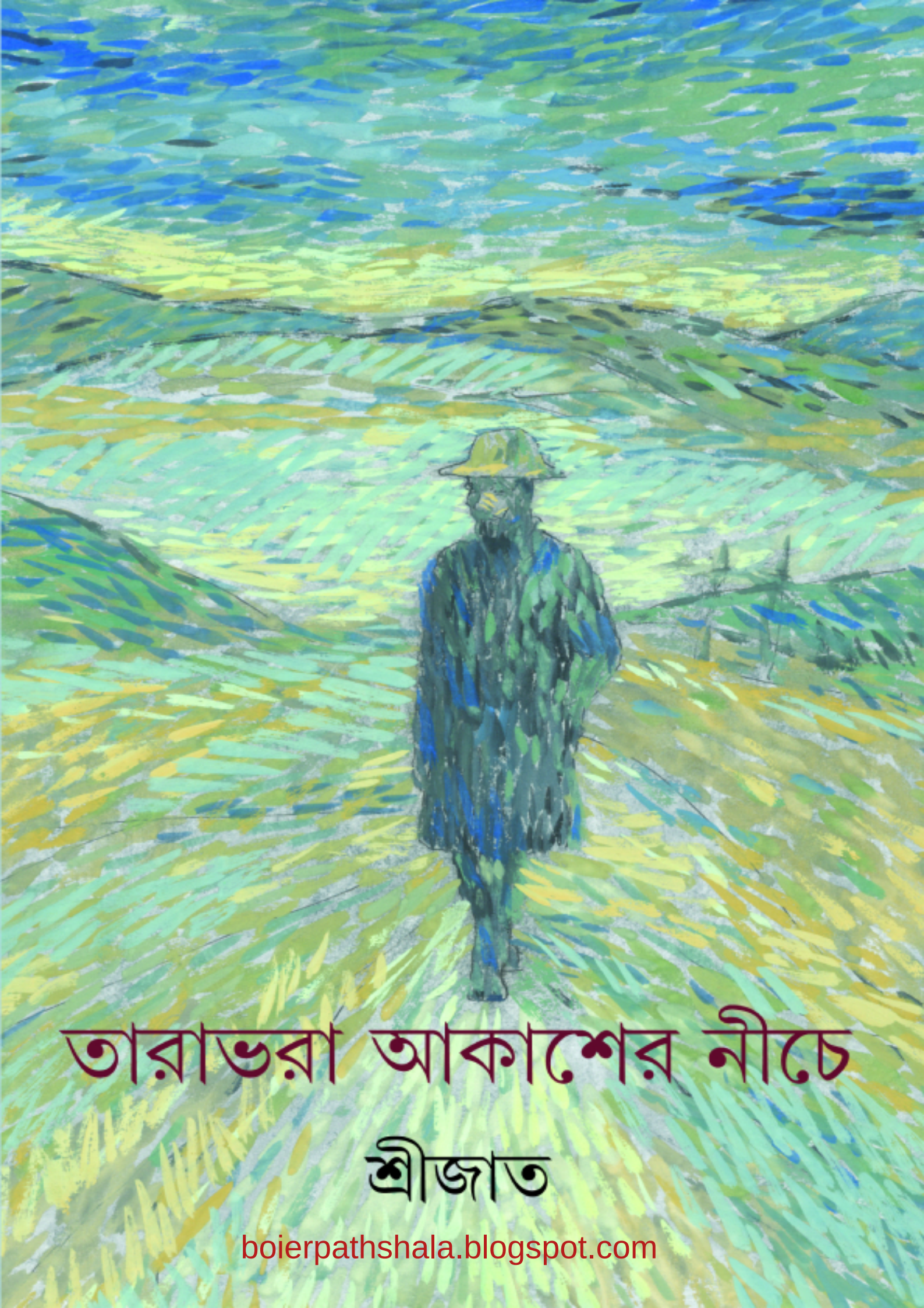

তারাভরা আকাশের নীচে

শ্রীজাত

boierpathshala.blogspot.com

তারাভরা আকাশের নীচে

শ্রীজাত

বাংলা পিডিএফ এর জন্য ভিজিট করুন

boierpathshala.blogspot.com

boidownload.com

boidownload24.blogspot.com

Facebook.com/bnebookspdf

facebook.com/groups/bnebookspdf

♥♥বইটি ভালো লাগলে হার্ডকপি কিনুন।♥♥

আমরা কোন পিডিএফ তৈরি বা সংরক্ষণ করি না, শুধু ইন্টারনেটে ছড়িয়ে থাকা পিডিএফ শেয়ার করি।

Email: jirograbity@gmail.com

কপিরাইট © শ্রীজাত ২০২০
প্রথম সংস্করণ: জানুয়ারি ২০১৮
প্রথম ই-বুক সংস্করণ: ২০২০

সর্বস্বত্ব সংরক্ষিত।
এই বইটি এই শর্তে বিক্রীত হল যে, প্রকাশকে
আবরণী ব্যতীত অন্য কোনও রূপে বা আকা
দেওয়া যাবে না এবং ঠিক যে-অবস্থায় ক্রেতা
অধিকার খর্ব করে, স্বত্বাধিকারী ও প্রকাশক উ
যান্ত্রিক, ফটোকপি, রেকর্ডিং বা পুনরুদ্ধারের স
পদ্ধতিতে পুনরুৎপাদন, সঞ্চয় বা বিতরণ কর
হবে। এই বইয়ের সামগ্রিক বর্ণসংস্থাপন, প্রচ্ছ
প্রকাশক।

ISBN 978-93-5040-856-8 (print)
ISBN 978-93-90048-81-6 (e-book)

প্রকাশক: আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটে
হেড অফিস: ৯৫ শরৎ বোস রোড, কলকাতা
রেজিস্টার্ড অফিস: ৪৫ বেনিয়াটোলা লেন, ক

CIN: U22121WB1957PTC023534

প্রচ্ছদ: সুব্রত চৌধুরী

বাংলা পিডিএফ এর জন

boierpathshala.blo

boidownload.

boidownload24.blo

Facebook.com/bne

facebook.com/groups/

♥♥বইটি ভালো লাগলে হার্ড

আমরা কোন পিডিএফ তৈরি ক
শুধু ইন্টারনেটে ছড়িয়ে থাকা পি

প্যারিস, কলকাতা, নিউ ইয়র্ক
তিনজনকেই

আমাদের প্রকাশিত
এই লেখকের অন্য গ্রন্থ

শালিমারে সংঘাত

‘বাস্তব হল কল্পনার বিরুদ্ধে দীর্ঘ এক ষড়যন্ত্র।
তাকে বিশ্বাস কোরো না।’

সূচিপত্র

অধ্যায়: ১

অধ্যায়: ২

অধ্যায়: ৩

অধ্যায়: ৪

অধ্যায়: ৫

অধ্যায়: ৬

অধ্যায়: ৭

অধ্যায়: ৮

অধ্যায়: ৯

অধ্যায়: ১০

অধ্যায়: ১১

অধ্যায়: ১২

অধ্যায়: ১৩

অধ্যায়: ১৪

অধ্যায়: ১৫

অধ্যায়: ১৬

অধ্যায়: ১৭

অধ্যায়: ১৮

অধ্যায়: ১৯

অধ্যায়: ২০

অধ্যায়: ২১

অধ্যায়: ২২

অধ্যায়: ২৩

অধ্যায়: ২৪

"On all sides, madness fascinates man. The fantastic images it generates are not fleeting appearances that quickly disappear from the surface of things. By a strange paradox, what is born from the strangest delirium was already hidden, like a secret, like an inaccessible truth, in the bowels of the earth."

Michel Foucault, Madness and Civilization.

প্লেস লা মার্টিন, আর্ল, ফ্রান্স
ডিসেম্বর, ১৮৮৮

বাতাসের সামনে তোমার সমস্ত অস্তিত্ব উড়ে যেতে চায়
এই বাতাস, যে বয়ে চলে আসছে কোন সেই দিনকাল থেকে
যার কোথাও কোনও ঠিকানা লেখা নেই
কেবল তার ঝাপটায়-ঝাপটায় তুমি পার হয়ে চলেছ
আরও একখানা দীর্ঘ শীতকাল
বরফের গুঁড়ো, নাকি স্মৃতি ঝরে পড়ার শব্দ ও?
তোমার দেখতে সাহস হয় না।
তুমি হেঁটে চলো, এগিয়ে চলো
আর তোমার কাঁধ থেকে খসে পড়ে নক্ষত্র
বাজারের দেনা, দুশ্চিন্তা, আর গতজন্মের ডানাদুটো।
এই সেই শীতকাল, যার দু'দিকে বয়ে গেছে জীবন।
তুমি জানো না, কোনদিক থেকে এসেছ।

বিকেল থাকতে থাকতেই ট্রেনটা পলকে নামিয়ে দিয়ে গেল স্টেশনে। ডিসেম্বরের শেষ, আর হাওয়াও বারবার সে-কথা জানিয়ে দিতে ভুলছে না। প্যারিসে যদি বা লোকের ভিড়ে শীত কিছুটা এড়িয়ে চলা যায়, শহর ছেড়ে বেরোলেই ঠান্ডাটা পেয়ে বসতে থাকে। এই এখানে যেমন, পল ভাবলেন। খাঁ খাঁ ছোট্ট একখানা শহরতলির স্টেশন, ট্রেনও দাঁড়ায় মোটে মিনিটখানেকের জন্যে। যতক্ষণ ট্রেনটা ধোঁয়া ছাড়ছিল, কিছুটা উত্তাপ তবু পাওয়া

যাচ্ছিল। এখন ডিসেম্বর তার দাপট দেখানো শুরু করেছে। অবশ্য শুধু শীত বললে মিথ্যেই বলা হবে, কেননা এবার বেশ মেঘও করে এসেছে এদিকে। বাতাসের গন্ধ শুঁকে যা বুঝতে পারছেন পল, বৃষ্টি হবেই। আর তার মানে, ঠান্ডা বেশ কাঁপুনি বয়ে নিয়ে আসবে এ বছর।

আর্ল-এর এই দিকটায় খুব ছড়িয়ে ছিটিয়ে মানুষজন থাকেন। বেশিরভাগই কৃষক পরিবার, আর কয়েকঘর ছোট-মোটো ব্যবসায়ীও আছেন বই কী। কেউ ক্যাফে চালান, কারও বা রুটির দোকান। প্যারিসের মতো লাগোয়া বাড়ির সারি এখানে তাই ভাবাই যায় না। একখানা বাড়ির সঙ্গে আরেকখানার দূরত্ব মানুষের সঙ্গে মানুষের মতোই। তবু এখানে এসে স্বস্তি পান পল। তাই ফিরে আসতে চান বারবার।

দস্তানাদুটো ভাল করে এঁটে নিয়ে হাঁটা লাগালেন পল। স্টেশন থেকে কয়েক মিনিটের মাত্র পথ, হেঁটেই চলে যাওয়া যাবে। বিশেষত তিনি যখন পরে আছেন বেশ ভারী একখানা ওভারকোট আর মাফলার। অনেকবার এসে থেকেছেন যেহেতু, আশে-পাশের বাসিন্দারা পলকে অল্পবিস্তর চিনেও গিয়েছেন। এই যেমন স্টেশন থেকে বেরোতেই টুপি খুলে অভিবাদন জানালেন মসিয়েঁ মিশেল। শহরের কারখানায় কাজ করেন তিনি, বাড়িতে ফুটফুটে একটি ছেলে রয়েছে তাঁর। পালটা অভিবাদন জানিয়ে চেনা রাস্তায় আর একটু দ্রুত পা চালালেন পল। এ সময়ে দিনের আলো বেশ তাড়াতাড়ি নিভে আসে। শহরে অবশ্য মানুষজন অপেক্ষাই করেন সন্ধে হওয়ার, কারণ তারপরেই জমে ওঠে ক্যাফেগুলো আর পানশালারা। কিন্তু এদিকটায় তেমন নয়। সন্ধে হয়ে যাওয়ার পর রাস্তাঘাটে বড় একটা লোকজন দেখা যায় না। দু'-একটা টিমটিমে ক্যাফে আছে বটে, কিন্তু এই জোর বাতাসের ডিসেম্বরে তারাও তাড়াতাড়ি ব্যাবসা বন্ধ করে দেয়।

রেলব্রিজের টানেল পেরিয়ে এপারে এসে তবু দু'-একটা জটলা দেখা গেল। যার-যার বাড়িতে ঢুকে পড়ার আগে স্থানীয় লোকজন নিজেদের মধ্যে নানারকম কথাবার্তা সারছে। পল যে রীতিমতো বিখ্যাত একজন ব্যক্তি, সে-খবর এখানে বড় একটা কেউ রাখে না। প্যারিস থেকে ছুটি কাটাতে আসা একজন সাধারণ নাগরিকই মনে করে সকলে তাঁকে। দিব্যি লাগে ব্যাপারখানা পলের। খ্যাতি, সে যত বড় মাপেরই হোক না কেন, আদতে মাইল দিয়ে মাপা যায়। কারও খ্যাতি শহর থেকে দশ মাইল অবধি গড়ায়, তো কারও বিশ মাইল। তারপর সকলেই সাধারণ, সকলেই সমান। হাঁটতে-হাঁটতেই কথাটা ভেবে মুচকি হাসলেন পল।

শীতের সন্ধের আকাশে, খুব দূরে, কোথাও একটা কারখানার চিমনি থেকে ধোঁয়া উঠছে। বুক পকেট থেকে ঘড়িটা বের করে মিলিয়ে নিলেন পল, ঠিক দশ মিনিট পরে

সাইরেন বাজবে। তার পরের আধঘণ্টা একটু সরগরম থাকবে বটে এই ছোট্ট বসতি অঞ্চল।

দূরে-দূরে বাড়ি, তারও দূরে-দূরে খেত। খুব ছড়িয়ে ছিটিয়ে দুটো-একটা দোকানপাট। আর বড়-বড় বাড়িদের প্রায় আদর করে পাশ দিয়ে মাফলারের মতো বয়ে যাওয়া চওড়া রাস্তা। মোদ্দা এমনটাই হল প্লেস লা মার্টিনের ছবিখানা। প্যারিস থেকে মাত্র কিছুক্ষণ দূরে যে এত অল্প মানুষ আর এত বেশি জায়গা থাকতে পারে, এ না দেখলে বিশ্বাস করা কঠিনই হত। অবশ্য নানা কাজে প্যারিসের বাইরে, ফ্রান্সের অন্যান্য ছোটখাটো জায়গায় মাঝে-মধ্যেই যেতে হয় পলকে। তাতে তিনি বুঝেছেন, প্যারিস একটা আলাদা গ্রহ। তাকে তুমি ভালবাসতে পারো, ঘৃণা করতে পারো। কিন্তু উপেক্ষা করতে পারো না।

ভাল অবশ্য তিনি আর্লকেও বেসে ফেলেছেন। আর ভালবেসেছেন আর্ল-এর মধ্যবর্তী এই ছোট্ট জনপদটিকে। আর সত্যি বলতে কী, তার চাইতেও বেশি ভালবেসেছেন সেই হলুদ বাড়িটিকে, যা নাকি এখন তাঁর গন্তব্য। যদিও সেই ভালবাসার একমাত্র কারণ বাড়িখানা নিজে নয়, বরং সেই বাড়ির নয়া ভাড়াটে মানুষটি, যে নাকি পলের বিশেষ বন্ধু। সে-লোকের বন্ধু বড় একটা হয় না কেউ, হয়নি কোনও দিন। পল বোধহয় হাতে গোনা দুই কী তিনজনের একজন, যারা সেই নয়া ভাড়াটের বন্ধু বলে সত্যি-সত্যি দাবি করতে পারেন। পলও করেন সেই দাবি। মনে-মনে যেমন করেন, তেমনই প্রকাশ্যেও করেন। বিরল অধিকারের দাবি করতে কে না ভালবাসে। আর পল তো সেই দাবি করেন রীতিমতো বুকফোলানো গর্বের সঙ্গে।

এই যে সটান প্যারিস থেকে ট্রেন ধরে চলে এলেন তিনি ব্যাগ গুছিয়ে (ও হ্যাঁ, পলের হাতে একখানা সুটকেস, তাতে শীতের কিছু জামাকাপড় আর কাজের সরঞ্জাম), সে জন্য তাঁর কাজের ক্ষতি যে হল না কিছু, এমনটাও নয়। শীতের মাঝামাঝি শহরে থাকাটা খুবই জরুরি হয়ে পড়ে, যেহেতু ক্রিসমাসের ছুটিতে শহরে নানা বড়-বড় জমায়েত লেগেই থাকে। আর কে না জানে, পৃথিবীতে নিজেকে চেনাতে হলে আগে চেনাতে হবে প্যারিস শহরকে। তা সেইরকম তিন-তিনটে দামি জমায়েতের আমন্ত্রণ উপেক্ষা করে পল চলে এসেছেন আর্ল। চলে এসেছেন হলুদ বাড়িখানার টানে (হলুদ বাড়ি নামটা অবশ্য তাঁর বন্ধুরই দেওয়া, নইলে তার সাদামাটা ঠিকানা ২ নম্বর প্লেস লা মার্টিন, আর্ল)। সত্যি বলতে কী, খ্যাপাটে বন্ধুটির টানেই।

সাত-পাঁচ ভাবতে-ভাবতে যখন হলুদ বাড়ির সামনে এসে দাঁড়ালেন পল, তখন দূরে কারখানার সাইরেন শুনতে পাওয়া যাচ্ছে, যেমনটা তিনি ভেবেছিলেন। রাস্তার কোণে গ্যাসের বাতিগুলো জ্বালিয়ে দেওয়া হয়েছে, হাওয়ার ঝাপটা আরও একটু বেড়েছে। আজ

রাতে কি বরফ পড়তে পারে? তবে মেঘ জমতেও দেখছেন তিনি এদিক-ওদিক। ছাই রঙের ভারী-ভারী মেঘ। বৃষ্টি হলেও অবাক হওয়ার থাকবে না সেক্ষেত্রে। আকাশের দিকে মুখ তুলে তাকিয়ে তেমনটাই মনে হল তেকোনা খয়েরি দাড়িওয়ালা পলের। কড়া নাড়ার আগে হলুদ বাড়ির সামনে কিছুক্ষণ দাঁড়ালেন পল, ওই শীতের বাতাসের মধ্যেই।

এত এতবার থেকে গিয়েছেন এই বাড়িখানায়, সত্যি তো! কখনও সামনে দাঁড়িয়ে তার দিকে ভাল করে তাকানো হয়নি! তাঁর খ্যাপাটে বন্ধু যে বারবার চিঠিতে উল্লেখ করে বাড়িটার কথা, সে নেহাত এমনি-এমনি নয়। সন্ধের নিভে আসা গোলাপি, ফরাসি আকাশের নীচে দাঁড়িয়ে এখন তেমনটাই মনে হল পলের। নেহাতই ছিমছাম হলুদ একখানা বাড়ি। কিন্তু যেন কী এক রহস্য লুকিয়ে আছে তার গায়ে। বাঁদিকে বাড়ির এক ভাগ, সেখানে থাকেন মাদাম ভেনেসা, সম্ভ্রান্ত এবং বিধবা এক মধ্যবয়সিনী, যিনি এ বাড়ির মালকিন। বাঁদিকের দুটি তলার মোট চারখানা ঘর একসঙ্গে ভাড়া নিয়েছে তাঁর বন্ধু। যদিও ভাড়া মেটাতে প্রাণ যায় আর কী। পরিপাটি গাঢ় হলুদ রং করে দেওয়া বাড়িখানার জানলা আর দরজা বেশ ঘন সবুজ রঙের। আর সেটাই যেন তাকে এই মহল্লার আর-পাঁচটা বাড়ির চেয়ে বেশ দূরে সরিয়ে রেখেছে। সামনে দিয়ে বয়ে যাওয়া রাস্তাখানাও কিছু কম হলুদ নয়। আর এসবের উপরে ফ্রান্সের সারাদিনের ঘন নীল আকাশ তো আছেই, যা এখন গোলাপি থেকে আস্তে-আস্তে ছাই আর লালের দিকে চলেছে। নাহ্, চোখ আছে বটে বন্ধুর। মনে-মনে তারিফ জানিয়ে এগিয়ে গেলেন পল।

গির্জার ঘড়িতে ছ'টা বাজার সঙ্গে-সঙ্গে টোকা পড়ল হলুদ বাড়ির সবুজ দরজায়। উপরের বাঁদিকের ঘরখানায় আলো জ্বলছে, দেখতে পেলেন পল। তার মানে কাজেই মেতে আছে তাঁর বন্ধু। ভেবে খুশি হলেন পল। এই পৃথিবীতে এমন কিছুই নেই যা তিনি এই বন্ধুটির জন্যে করতে পারেন না। কিন্তু কিছু করেই কি তাকে খুশি রাখা যায়? উঁহু, তাকে কেবল খুশি রাখতে পারে কাজ। আরও আরও কাজ, নতুন-নতুন কাজ। বন্ধুর নতুন কাজ দেখার কথা ভেবেই মনটা চনমনে হয়ে উঠল পলের। আর একবার টোকা দেবেন বলে ভাবছেন, এমন সময়ে নেমে এসে দরজা খুলল বন্ধুটি। আগেরবার যা দেখে গিয়েছিলেন, তার চাইতেও বেশ খানিকটা যেন রোগা হয়ে গিয়েছে। কিন্তু চোখের নীল মণি থেকে ঠিকরে বেরোনো খিদেটা একইরকম আছে।

"এত দেরি হল কেন তোমার?" অভিযোগের সুর বন্ধুর গলায়।

পল সামান্য হেসে বললেন, "এই ঠান্ডায় বাইরেই দাঁড় করিয়ে রাখবে নাকি? ভিতরে চলো, প্যারিসের খবর শোনাই তোমাকে।"

মুহূর্তে ছদ্মরাগ উবে গিয়ে ফুটে উঠল হাসি, যা দশ বছরের বাচ্চার চেয়ে বড় কারও হতেই পারে না। হাতের তুলিটা কোমরে গুঁজে সদ্য রংলাগা জামাতেই পল গগ্যাঁকে জড়িয়ে ধরলেন ভিনসেন্ট। ভিনসেন্ট ভ্যান গঘ। আর সেইসঙ্গে, যা আশা করেছিলেন পল, এই সন্ধে হয়ে আসা আকাশ ভেঙে হুড়মুড়িয়ে নামল এক তোড় বৃষ্টি। তাঁর বন্ধু এক টানে তাঁকে টেনে নিলেন দরজার ওপাশে।

২

ক্লিনিক ওপেন মাইন্ড, থিয়েটার রোড, কলকাতা
অক্টোবর, ২০১৭

"ট্যাঙ্কটা ঠিক কোথায় দাঁড়িয়ে ছিল?"

"আমাদের বেডরুমে। বিছানার সামনে।"

"তুমি ঠিক দেখেছ? ঘুমচোখে ভুল হয়নি কোনও?"

"আমি তো ঘুমোইনি তখনও। দেড়টা নাগাদ হবে। জেগেই ছিলাম।"

"বই পড়ছিলে?"

"উঁহু, গান শুনছিলাম। ওই সময়টা আমি গান শুনি রোজ।"

"তারপর? কী হল হঠাৎ?"

"কিছুই না, মাথা নিচু করে গান শুনছিলাম, হঠাৎ মুখ তুলে তাকাতেই দেখি ঘরের মধ্যে বিশাল ট্যাঙ্কটা দাঁড়িয়ে আছে।"

"তোমাদের বেডরুম কত বড়?"

"খুব বড় নয়, কিন্তু তখন তো আর বেডরুম বলে মনে হচ্ছে না। বিছানায় বসে আছি ঠিকই, কিন্তু সামনে তাকিয়ে দেওয়াল, ফোটো ফ্রেম, আয়না, এসব কিছু দেখতে পাচ্ছি না। জাস্ট প্রচুর এবড়ো-খেবড়ো ভাঙা কংক্রিটের চাঁই, লোহার শিক আর ঘরময়... আই মিন, ধুলো।"

"ইউ মিন টু সে, ডেব্রি?"

"তা-ও বলতে পারেন... হ্যাঁ, ডেব্রি। আর তার মধ্যে বিশাল ট্যাঙ্কটা দাঁড়িয়ে আছে। ঠিক দাঁড়িয়ে নেই, এগিয়ে আসছে। আমি ইন ফ্যাক্ট ঘড়ঘড় আওয়াজও শুনতে পেয়েছি তখন। আর নলটা স্ট্রেট আমার দিকে, মানে, আমাদের বিছানার দিকে তাক করা।"

"কতক্ষণ ছিল, ব্যাপারটা?"

"এগ্‌জ্যাক্টলি জানি না, কিন্তু বেশ কিছুক্ষণ মনে হয়েছে।"

"তারপর কী হল?"

"ন্যাচরালি, এই সময়গুলোয় সেন্স অফ স্পেস অ্যান্ড টাইম, মানে, গুলিয়ে যায় আর কী। আমিই বোধহয় অল্প চেঁচিয়ে ফেলেছি, তাতেই শর্মিলার ঘুম ভেঙে যায়। তখন ও আমাকে দেখেই বুঝতে পারে যে আবার ওরকম হচ্ছে। ও হাত ধরে ঝাঁকাতেই ছবিটা ভ্যানিশ হয়ে যায়।"

"তখন কি শরীর খারাপ লাগে? পাল্‌স বা প্রেশার বেড়ে যায় বা ওরকম কিছু হয়?"

"না, তা হয়তো হয় না, কিন্তু বেশ কিছুক্ষণ একটা ট্রান্স চলতে থাকে। মানে কোনটা রিয়্যাল, এই নিয়ে একটা কনফিউশন তৈরি হয়। খুব কম সময়ের জন্য।"

"ন্যাচরালি। কীরকম ফ্রিকোয়েন্সিতে হয় ব্যাপারটা? রোজ নয় নিশ্চয়ই? বা কীরকম সময়ে হয় সেটাও যদি বলো।"

"রোজ না হলেও, সপ্তাহে দু'-তিন বার হয়। আর সময়ের কোনও ঠিক নেই। যে-কোনও সময়ে হতে পারে। ইন ফ্যাক্ট, একবার ড্রাইভ করতে করতেই হল। খুব জোর বেঁচে গিয়েছি সেদিন।"

"হুম। জাস্ট আর কয়েকটা প্রশ্ন করব ঋত্বিক। তারপর তুমি ফ্রি। ও কে?"

"ও কে।"

"এই যে হঠাৎ এসব দেখছ, তার বেশিরভাগটাই কি বেশ ভায়োলেন্ট? বা অ্যাট লিস্ট রিলেটেড টু ভায়োলেন্স? এই যেমন ট্যাঙ্ক দেখছ, মানে যুদ্ধের সঙ্গে এর একটা কানেকশন আছে। সেরকম দৃশ্য বেশি দেখছ?"

"নাহ্... তা কিন্তু নয়। রাদার এক-দু'বারই এরকম হয়েছে। বাকি সময়ে নর্ম্যাল। অবশ্য নর্ম্যাল বলি কী করে, টু আদার পিপল ইট কুড বি রিডিকিউলাস অর ইভন অ্যাবসার্ড।"

"একটা এগজ্যাম্পল দেবে প্লিজ? তারপর আর কোনও প্রশ্ন নয়।"

"এগজ্যাম্পল... এগজ্যাম্পল... এই পরশুর আগের দিন, অফিস থেকে পার্কিং-এ নামছিলাম। এলিভেটরে একাই ছিলাম। হঠাৎ স্পষ্ট দেখতে পেলাম কোত্থেকে এলিভেটরের মধ্যে জল ঢুকছে। হু-হু করে। যেভাবে ঢুকছে, তাতে পার্কিং লেভেলে পৌঁছোনোর আগেই আমার মাথা পেরিয়ে যাবে। তারপর, অল অফ আ সাডেন, কিচ্ছু নেই। নর্ম্যাল।"

"আই সি। থ্যাঙ্ক ইউ সো মাচ। তোমাকে অনেকক্ষণ বকবক করালাম। এবার আমি শর্মিলার সঙ্গে একটু আলাদা করে কথা বলব। হোপ ইউ ওন্ট মাইন্ড?"

"না না, আপনারা কথা বলুন, আমি বাইরে আছি।"

ঋত্বিক বাইরে বেরিয়ে যাওয়ার পর শর্মিলার দিকে তাকালেন ডক্টর রুখসার আহমেদ। বছর চল্লিশেক বয়েস, চশমা পরা সপ্রতিভ আর ঝকঝকে চেহারার মানুষই বলা চলে

তাঁকে। কলকাতা শহরের নামী-দামি সাইকোথেরাপিস্টদের একজন রুখসার। গত বছর ঋত্বিকদের অফিসের এক পার্টিতে ঋত্বিক আর শর্মিলার সঙ্গে আলাপ রুখসারের। আর কী অদ্ভুত যে, তখন শর্মিলা ভাবতেই পারেনি, এক বছরের মধ্যে তাদের রুখসারের চেম্বারে আসতে হতে পারে।

শর্মিলার দিকে তাকিয়েই বুঝতে পারলেন রুখসার, কী পরিমাণ ঝড়ঝাপটা তার মাথার উপর দিয়ে বয়ে চলেছে এখন। এক বছর আগের সেই পার্টির শর্মিলা অনেক বেশি উচ্ছ্বল আর প্রাণবন্ত ছিল, নিশ্চিত বলা যায়।

"কতদিন ধরে চলছে এসব, শর্মিলা?"

"মাস তিনেক হবে। প্রথম দিকে কমই হত। আমাকে বলত কিছু-কিছু, আমি বিশেষ পাত্তা দিইনি। প্রোমোশন হয়েছে, ফলে অফিস পলিটিক্স, রেসপনসিবিলিটি আর ওয়র্ক লোড, তিনটেই দ্বিগুণ হয়ে গিয়েছে। তাই ভাবছিলাম, স্ট্রেস থেকে হচ্ছে, কমে যাবে। কিন্তু বাড়তে থাকল। শেষ দু'-তিন সপ্তাহে এত বেশি হয়েছে যে আই ডিসাইডেড টু কাম টু ইউ।"

"হুম, ঠিক সিদ্ধান্ত। আচ্ছা, তোমরা তো অনেকদিন চেনো একে অপরকে। ও কি বরাবর খুব কল্পনাপ্রবণ? ওভার ইম্যাজিনেটিভ?"

"কখনও আলাদা করে সেরকম মনে হয়নি। ছবি আঁকা শিখত অবশ্য, আর্ট কলেজে ভরতি হয়েছিল। হি ওয়জ় ভেরি প্যাশনেট অ্যাবাউট ইট। কিন্তু যা হয়, বাবা-মা'র চাপে পড়ে সেসব ছেড়েছুড়ে পুরো অন্যদিকে চলে যেতে হয়। তার জন্যে একটা আক্ষেপ আছে কোথাও, আমি বুঝি। কিন্তু ওভার ইম্যাজিনেটিভ কখনও মনে হয়নি। তোমার কী মনে হয়, এর সঙ্গে..."

"না-না, আমি এখনই কোনও কনক্লিউশনে যেতে পারব না। কিন্তু পেশেন্ট সম্বন্ধে... সরি টু কল হিম ওয়ান... আমাদের যতটা সম্ভব তথ্য জানতে হয়। স্পেশ্যালি তার অতীত। একদিনে তো সব হয় না, তোমাদের প্রতি সপ্তাহে আসতে হবে হয়তো। আমি সেডেটিভও লিখে দেব, ঘুমটা হওয়া খুব দরকার। এ ধরনের হ্যালুসিনেশন আসলে একটা টানেলের শুরু। আমরা চাইব না ঋত্বিক সেই ওয়ান ওয়ে টানেলটায় ঢুকুক। তাই না?"

উত্তরে শর্মিলা খুব শুকনো একটা হাসি তৈরি করতে পারল। কারণ এই হেমন্তের সন্ধেবেলায়, মধ্য কলকাতার সন্ধেবেলায় সে ভালই বুঝতে পারছে, সামনের দিনগুলো সহজ হবে না।

ওষুধ লিখে দিয়ে রুখসার তাকালেন শর্মিলার দিকে।

"দিস ইজ় ড্যাম সিরিয়াস শর্মিলা। আই হোপ তুমি বুঝতে পারছ আমি কী বলছি।"

"হ্যাঁ, পারছি।"

শর্মিলা চুপ। রুখসার চুপ। বাইরে, হেমন্তের অল্প শিরশিরে সন্ধেবেলায় একটা সিগারেট ধরিয়ে ফুটপাথে দাঁড়িয়ে আছে ঋত্বিক। সিগারেট, সে দেখেছে, খুব ভাল স্টপ ওয়াচ। এটা শেষ হলেই সে ভিতরে যাবে এবং নিশ্চিত দেখতে পাবে যে ডক্টর রুখসার আর শর্মিলার কথাবার্তা শেষ হয়েছে। কিন্তু শেষ টানটা নেওয়ার পর ডাস্টবিনে ঘষে, নিভিয়ে সিগারেটটা ফেলে দেওয়ার পর তার একবার মনে হল অন্য কোনও শহরে দাঁড়িয়ে আছে। চারপাশের বাড়িঘর, ট্র্যাফিক আর দোকানপাট তার চেনা নয়। সে কেন এখানে দাঁড়িয়ে সিগারেট খাচ্ছিল, আর এবার যাবেই বা কোথায়, তা-ও জানা নেই। গোটা ব্যাপারটাই অজানা। এরকমও তার হয় মাঝে-মাঝে, আর হলে একটু ভয়-ভয়ই লাগে। লস্ট মনে হয় খুব। অস্বস্তি হয়। এটা যদিও শর্মিলাকে জানায়নি সে। আর থাকেও খুব কম সময়। হয়তো পাঁচ সেকেন্ড বড়জোর। তারপর সব ফিরে আসে। এই যেমন এখনই সে বুঝতে পারছে, তাকে ফিরে যেতে হবে ক্লিনিকে।

ঋত্বিক ফিরে আসার সময় হয়ে গিয়েছে ভেবেই শর্মিলা আর রুখসারের মুখে স্বাভাবিক ভাবটা ফিরে এসেছিল। ঋত্বিক ঢুকতেই যেটা হাসিতে বদলে গেল।

"ঋত্বিক। উই হ্যাভ টু ডিল ইট সিরিয়াসলি, কেমন? এটা নিয়ে হেলাফেলা কোরো না প্লিজ।"

রুখসারের কথা মেনে নিয়েই ঋত্বিক উত্তর করল, "প্রশ্নই নেই। একদিকে বউ, অন্যদিকে ডাক্তার। প্রাণে বাঁচতে হবে তো!"

এক চোট হাসির পর চেম্বার থেকে বেরিয়েই আসছিল ঋত্বিক-শর্মিলা, রুখসার জিগ্যেস করলেন, "বাই দ্য ওয়ে ঋত্বিক, এমন কোনও দৃশ্য আছে, যেটা এই ক'মাসে তুমি একের বেশি বার দেখেছ? মানে, কিছু কি রিপিটেটিভলি আসে? বারবার?"

"বারবার? হ্যাঁ, আসে তো। এটা বলা হয়নি, না?"

"দিস ইজ় ইম্পর্ট্যান্ট। আসে তা হলে? ওকে। কী দ্যাখো বারবার?"

"ওই একটা দৃশ্যই দেখতে পেলে মনে হয় বাস্তবে না ফিরলেও চলবে।"

"তার মানে ইটস আ গুড ওয়ান?"

"হুঁ, খুবই ভাল।"

রুখসার একটা অর্ধেক আশা নিয়ে তাকিয়ে আছেন ঋত্বিকের বেশ ঝলমলে মুখের দিকে। শর্মিলার অবশ্য তথ্যটা জানা বলে তার মুখ আগের মতোই নিভে আছে।

"কী সেটা?"

"দ্য স্টারি নাইট। আমার চারপাশটাই 'দ্য স্টারি নাইট'-এর ছবিটার মতো হয়ে যায়। আমি হুবহু ওই চারপাশ, ওই গাছ, বাড়ি, রাতের আকাশটা দেখতে পাই। ইন ফ্যাক্ট, ছবিটার মধ্যে হেঁটে বেড়াই।"

"দ্য স্টারি নাইট?"

"হ্যাঁ।"

"ভ্যান গঘ?"

"হ্যাঁ, ভ্যান গঘ।"

৩

হলুদ বাড়ি, আর্ল, ফ্রান্স
ডিসেম্বর, ১৮৮৮

সেই সন্ধের পর দিনকতক কেটে গেছে। পল আর ভিনসেন্ট জমিয়ে সময় কাটাচ্ছেন হলুদ বাড়িতে। বাইরে খুব একটা বেরোচ্ছেন না। আর বেরোবেনই বা কেমন করে? টানা বৃষ্টি এলাকার লোকজনকে বেশ একটু ঘরবন্দিই করে রেখেছে এ ক'দিন। জানলা দিয়ে নজর রেখেছেন পল, নেহাত রোজগারের তাগিদ ছাড়া এ অঞ্চলের লোকজন তেমন বেরোচ্ছেন না মোটেই। আর যারা এই বিশ্রী আবহাওয়াতেও সময় কাটাচ্ছে বাড়ির বাইরে, তাদের দুর্মতিকে মনে-মনে একরকম তারিফই জানাচ্ছেন তিনি। তবে হ্যাঁ, বাইরে না বেরিয়ে একটা ব্যাপার বেশ ভালই হয়েছে বলতে হবে, দুই বন্ধু মিলে কাজ নিয়ে দেদার আলোচনায় মজে যাওয়া গিয়েছে। এর জন্যেই তো আসা!

ইতিমধ্যে অনেকগুলি ক্যানভাস শেষ করে রেখেছে ভিনসেন্ট, যেমন সে প্রতিবারই করে। অল্প সময়ে বেশি কাজ তার বরাবরের স্বভাব বলেই পল জেনে এসেছেন। তবে ইদানীং যেন সে কাজের গতি বেশ কিছুটা বাড়িয়েই দিয়েছে। গত কয়েকদিনে যখন এমনই ক্যানভাসে স্ট্রোক দিচ্ছিল সে, অবাক হয়ে তাকে লক্ষ করছিলেন পল। এমন দ্রুতগতিতে তুলি চালাতে তিনি আর কাউকে দেখেননি নিশ্চিত। আর দেখেননি কাজের সময়ে এমন পাগলামো। নিজের ঘরখানাও সে করে রেখেছে বিচিত্র। কষ্ট করে কোনওমতে দাঁড়ানো যাচ্ছে ঘরখানায়।

ভিনসেন্টের ঘরের অবস্থা অবশ্য এর চাইতে কিছু ভাল আশা করেননি পল। নানা সময়ে ভিনসেন্ট নানা জায়গায় থেকেছে, কিন্তু তার ঘর হয়ে থেকেছে একইরকমের ছন্নছাড়া আর অগোছালো। যেন পরিচিত যে-কেউ ঢুকেই বলে দিতে পারবে, এটা বিলক্ষণ ভিনসেন্টের ঘর। দোতলার একখানা ঘরকেই সে বানিয়ে নিয়েছে নিজের কাজের ঘর, কেতাবি ভাষায় যাকে বলে স্টুডিয়ো। যদিও যেভাবে এখন আছে সে-ঘর, দেখলে স্টুডিয়ো মনে করা দুষ্কর।

ভিনসেন্ট যতক্ষণ তাঁর বন্ধুর জন্যে এক মগ কফি বানাচ্ছেন ওপাশের করিডরে, ততক্ষণ পল জানলায় দাঁড়িয়ে দেখছেন বাইরেটা। কী দ্রুত সন্ধে হয়ে যায় শীতকালে। দূরে-দূরে ছোট-ছোট আলো জ্বলে রয়েছে, তারপর বসতি পার করে অন্ধকার গমখেত, যা কিনা সকালে নিজের সোনালি ঔজ্জ্বল্য ছড়িয়ে দেয় চারপাশে, আর হয়ে ওঠে তাঁর এই পাগল বন্ধুর কাজের প্রিয় বিষয়গুলির একটি।

এর মধ্যে অবশ্য আর একখানা কাজ ভারী মন কেড়েছে পলের। ফুলদানিতে এক গুচ্ছ সূর্যমুখী ফুল। নেহাতই সাধারণ এক বিষয়, বিলক্ষণ জানেন পল। কিন্তু তার মধ্যেই তাঁর শিল্পী বন্ধুর মুনশিয়ানা লুকিয়ে আছে। ভিনসেন্ট অবশ্য, পল দেখছিলেন, এই একটি ছবি বিষয়ে বেশ প্রত্যয়ী। এটিকে সে নিজের আঁকা সেরা ছবি বলতেও পিছপা হয়নি এই ক'দিনে।

আজ দুপুর থেকে বৃষ্টিটা ধরেছে। রাস্তায় বিকেল থেকেই লোকজনের আনাগোনা শুরু হয়েছে তাই। ওই কোণের দিকে, রাস্তাটা ঘুরে গিয়েই একটি গোলাপি বাড়ি, তার নীচে ছোট্ট শামিয়ানায় দু'-একটা আলো জ্বলে উঠেছে, আর এই নিস্তব্ধতার মধ্যে বলেই বোধহয়, কান পাতলে পল শুনতে পাচ্ছেন কাচের গেলাসের আর কাঁটা চামচের আওয়াজ। মাদাম ভেনেসার ছোট্ট রেস্তোরাঁ আজও জমে উঠেছে তা হলে। এ বাড়ির কর্ত্রীই চালান রেস্তোরাঁটা, আর রাতে ভিনসেন্ট ওখানেই খায়। তার পকেটে অবশ্য খুব সুস্বাদু ডিনার এঁটে ওঠে না, তবুও সে রোজ রাতে মাদাম ভেনেসার খদ্দের হতেই পছন্দ করে। পল এলে অবশ্য একটু ভালমন্দ খাবারের আশা থাকে, কেননা চারদিকে পলের এখন যেমন নামডাক, তাতে দু'-তিন রাত দু'জন মানুষের সুস্বাদু ডিনার সে কিনতেই পারে।

পল দাঁড়িয়ে-দাঁড়িয়ে ভাবছিলেন বাড়িটার কথাও। কী বেশ একটা আছে এই বাড়ির চারপাশে আর ঘরগুলোয়, ভিনসেন্টের মতো ভবঘুরেও এখানে স্থায়ী আস্তানা বাঁধতে চাইছে যে কারণে। শুধু যে এটুকুই চাইছে তা নয়, সে এটাকে রীতিমতো শিল্পীদের শিবির করে তুলতে চায়। একেবারে গোড়ার দিন থেকেই তার ইচ্ছে, এই প্রিয় হলুদ বাড়ি ফ্রান্সের তরুণ আঁকিয়েদের সম্মিলিত কাজের জায়গা হয়ে উঠুক। ভাড়া লাগবে না, কিচ্ছু লাগবে না। এসো, থাকো, একসঙ্গে কাজ করো। তবেই না গড়ে উঠবে কালেক্টিভ আর্ট সোসাইটি? এ বুদ্ধি অবশ্য দশ বছর আগের ভিনসেন্টের মাথায় খেলত না কখনওই, অন্তত পল সে কথা ভালই জানেন। সে পড়ে ছিল প্রত্যন্ত গ্রামগুলোয়, আঁকছিল গ্রামীণ জীবনের ছবি। তাতে অবশ্য তার কাজের কিছু ক্ষতি হয়নি, কারণ আর কেউ না জানুক পল অন্তত জানেন, ভিনসেন্ট একজন স্বাভাবিক শিল্পী। মাঝে-মধ্যে সে দেখে-দেখে তালিম নেওয়ার চেষ্টা করেছে বটে, কিন্তু প্রতিভাটা সে নিয়েই জন্মেছে। আর সে-প্রতিভা যে এখন প্যারিসে

বিরল, এ কথাও বিশ্বাস করেন পল। যদিও আঁকার বিষয়ে বহু সময়েই ভিনসেন্টের সঙ্গে তর্ক বেধে যায় তাঁর।

তবে হ্যাঁ, প্যারিস ভ্রমণ ভিনসেন্টের চোখ খুলে দিয়েছে। কবে থেকে তিনিও বলছিলেন ভিনসেন্টকে, একবার প্যারিসে গিয়ে ক'টাদিন থেকে আসতে। পারলে ওইখানেই থেকে যেতে। পৃথিবীর সেরা ক্যানভাসের কয়েকখানা এখন তো ওই প্যারিসেই আঁকা হচ্ছে। শিল্প শিবির হয়ে যাচ্ছে একের পর এক, বিপ্লব আসছে রং-তুলির জগতে। সেসব না দেখে নিজের মতো কাজ করে যাওয়াটা মোটেই বুদ্ধির পরিচয় নয়। ভিনসেন্টের ভাই থিও ব্যবস্থাপাতি না করে দিলে অবশ্য তার প্যারিসে গিয়ে ক'টাদিন থাকা হয়ে উঠত না। এ কথা ভেবে মনে-মনে থিওকে একটা ধন্যবাদই দিলেন পল। সে শুধু নিজের ভাইয়ের স্বার্থেই সবরকম সাহায্য করে যাচ্ছে তা নয়, সেই সাহায্য আসলে এসে পৌঁছোচ্ছে ইউরোপের চিত্রকলার কাছে, ভিনসেন্ট যার অবিচ্ছেদ্য অংশ এখন। অনেকেই মানতে চান না তা, কিন্তু পল এ কথা জোর গলায় বলে বেড়ান বই কী।

তা ওই প্যারিসে থাকাকালীনই আর্টিস্টস রেসিডেন্সের ভূতটা ভিনসেন্টের মাথায় চাপে। সে আর্ল-এ ফিরে এসে হলুদ বাড়িখানা ভাড়া নিয়েই পরিচিত শিল্পীদের চিঠি ছাড়তে থাকে। 'চলে এসো, থাকো, আঁকা যাক একসঙ্গে'। কিন্তু সাড়া দেয়নি তেমন কেউ। ভিনসেন্টকে অত গুরুত্ব কেউই দেয় না যে তার কথায় বাক্সপ্যাঁটরা বেঁধে ছবি আঁকতে ছুটে আসবে। দফায়-দফায় এসেছেন কেবল সহৃদয় পল, কারণ তিনি জানেন, তাঁর এই খ্যাপাটে বন্ধুটি পৃথিবীর অন্যতম সেরা আঁকিয়ে হিসেবে নাম কিনবে একদিন।

দফায়-দফায় অবশ্য যাচ্ছেতাই ঝগড়াও হয়েছে তাঁদের। ভিনসেন্টকে বোঝা বড়ই মুশকিল, এই ক'বছরে এটা অন্তত বুঝেছেন পল। এই ভাল আছে তো এই খারাপ। আর খারাপ হলে তার কাণ্ডজ্ঞান পুরোপুরি লোপ পায়। তখন আর তার সঙ্গে থাকা যায় না। তবু তারই কাছে ফিরে-ফিরে আসেন পল, যেমন এবারের শীতে এসেছেন আবার। আর এখন ভাবছেন, মাদাম ভেনেসার রেস্তোরাঁয় হাঁসের মাংস ও ওয়াইন সহযোগে আজ সারা যাবে ডিনার। তবে ডিনার হতে হবে দ্রুত, কারণ আজ পল চাইছেন রাতের শেষ ট্রেনটা ধরে প্যারিস পাড়ি দিতে। এবার একবার প্রিয় শহরে না পৌঁছোলেই নয়।

"থাকছ তো এখন? না প্যারিস ফেরার মতলব ঘুরছে মাথায়?"

সন্দেহের চোখে পলের গোছানো সুটকেসটার দিকে তাকিয়ে কফির মগ এগিয়ে দিতে-দিতে কথাটা বললেন ভিনসেন্ট। এই সময়গুলোয় তাঁর মুখ হয়ে যায় কোনও দশ বছরের বাচ্চার মতোই।

পল সামান্য হাসলেন। তবে মনে-মনে প্রমাদ গুনলেন এই ভেবে যে, তাঁর ফিরে যাওয়ার খবর শুনে বন্ধুটি ঝামেলা পাকাতেই পারে। নেহাত কায়দা করে কথাটা আজ পাড়তে হবে তাঁকে। খুব বেশি ঝামেলা করলে না-হয় আগামীকাল যাওয়া চলতে পারে, কিন্তু তার বেশি দেরি করা যাবে না একেবারেই।

"থাকব বলেই তো এসেছি। কিন্তু কী জানো, একটা নতুন কাজ মাথায় ঘুরছে, সেইটা নিয়ে লেগে পড়তে হবে কাল থেকে। দেখা যাক। তুমি তো ঘর একেবারে ক্যানভাসে ভরিয়ে ফেলেছ।"

"তুমি তো জানোই আমি খুব তাড়াতাড়ি কাজ শেষ করি। কাজের সময় আর বাইরে কী হচ্ছে বুঝতে পারি না। কেবল মনে হয় সামনে থেকে সব মুছে যাবার আগে আমাকে শেষ করে ফেলতে হবে কাজটা।"

"মুছে যাবে মানে? ওই তোমার গমখেত আর সাইপ্রেস গাছ কীভাবে মুছে যাবে ভিনসেন্ট?"

"জানি না পল। কিন্তু আমার কেবল ভয় হতে থাকে, এসব যদি অদৃশ্য হয়ে যায় হঠাৎ? কিংবা হয়তো ভয়টা উলটোই। আমিই যদি ফুরিয়ে যাই ক্যানভাস ফুরোনোর আগে? তাই ঝটপট একটা শেষ করে আর একটায় হাত দিই।"

"তোমার মনে হয় না, এক-একটা ক্যানভাসকে অন্তত আর একটু সময় দিলে ভাল?"

"আমার কোনওদিনই তা মনে হয়নি পল, তুমি তো জানো। রং তুলি আর ক্যানভাস হাতে পেলে আমি তোমাদের মতো স্থির থাকতে পারি না। একটা ঝড়ের মধ্যে ঢুকে পড়ি। আর তারপর আমার আর কিছু করার থাকে না।"

"কিন্তু কাজগুলো এভাবে ফেলে রাখলে তো নষ্ট হয়ে যাবে।"

"কী উপায় বলো, অনেক ধরে-করেও একখানা বিক্রি করতে পারি না। থিও অবশ্য গত হপ্তাতেই নিয়ে গিয়েছে কয়েকটা, দেখি যদি ও প্যারিসে কাউকে বিক্রি করতে পারে। আমি এখানে চেনাশোনা অনেককে বলে দেখছি পল, কেউ আমার ছবি কিনতে চায় না।"

"ওভাবে ভেবো না ভিনসেন্ট, তোমার ছবির সময় এখনও আসেনি। একদিন আসবে।"

"তোমার তাই মনে হয় পল? লোকে কিনবে আমার ছবি?"

"সত্যি বলতে কী ভিনসেন্ট, একদিন লোকে তোমার ছবি দেখবে কেবল। কেনার ক্ষমতা থাকবে না।"

কথাটা আন্তরিক ভাবেই বললেন পল, কিন্তু ঘর কাঁপিয়ে হেসে উঠলেন ভিনসেন্ট। প্রাণখোলা এই হাসি আগেও বেশ কয়েকবার শুনেছেন পল। কথাটায় বেশ মজা পেয়েছে

তাঁর বন্ধুটি। ঘরের এদিকে-ওদিকে খালি হয়ে যাওয়া দোমড়ানো টিউব পড়ে আছে রঙের, কেবল টেবিলের উপর একটা নতুন অয়েল কালারের সেট। ভাল জিনিস, নিশ্চয়ই প্যারিস থেকে এসেছে। থিও রং কিনে-কিনে পাঠায়, নইলে ভিনসেন্টের আঁকা কবেই বন্ধ হয়ে যেত। আর সে যা দ্রুত রং খরচা করে! ভিনসেন্টের একটা ক্যানভাসে যা রং লাগে, তাতে পলের তাহিতি সিরিজের গোটা দশেক ছবি আঁকা হয়ে যাবে দিব্যি।

"হাতে কাটল কী করে?"

পল এতক্ষণে খেয়াল করলেন, ভিনসেন্টের বাঁ হাতের তর্জনী ব্যান্ডেজ করা আছে।

"ও কিছু না।"

আড়চোখে তাকিয়ে এড়িয়ে গেলেন ভিনসেন্ট। বন্ধুর এই ভাবটিও পলের বিলক্ষণ জানা, সে এখন হাজার সাধলেও এ বিষয়ে কিছু বলবে না। অগত্যা কথা ঘোরালেন পল।

"তারপর? প্যারিসে আর কী হল বলো। রূপসিদের সঙ্গে আলাপ হল? সে গল্প তো শোনাই হয়নি।"

"ওহো, তোমাকে বলিনি না? চলো বসা যাক ও ঘরে। এসো..."

পল'কে হাত ধরে পাশের ঘরে নিয়ে গেলেন ভিনসেন্ট, প্যারিস বিষয়ে তাঁর উত্তেজনার ঘোর এখনও কাটেনি। ওই ঘরেই, হলদেটে আলো জ্বেলে শুরু হল গল্প।

সেই আলো, খুব ক্ষীণ হলেও দেখা যাচ্ছিল মাদাম ভেনেসার রেস্তোরাঁর বাইরের টেবিল দুটি থেকে, যার একটিতে প্লেস লা মার্টিনের দুই বয়স্ক ব্যবসায়ী সুপ আর ওয়াইন দিয়ে ডিনার সারছিলেন। শীতটা আজ সত্যি জাঁকিয়ে পড়েছে। উত্তরের হাওয়ায় হাড়ে কাঁপুনি লাগিয়ে দেওয়ার জোগাড়। আর বেশিদিন বোধহয় বাইরে বসে ডিনার সারার আরামটা পাওয়া যাবে না। এই দুই বুড়োর মধ্যেও কথা হচ্ছিল প্যারিস নিয়েই। সামনের হপ্তায় একবার প্যারিস গিয়ে কিছু কেনাকাটা করে আনতে পারলে ভাল হয়, একজন বলছিলেন সে-কথা। অপরজন বলছিলেন, স্থানীয় বাজারেই সেসব জিনিস একটু সস্তা দরে পাওয়া যেতে পারে। মাদাম ভেনেসা এমন সময়ে এই দুই খদ্দেরের দেখভাল করবার জন্যে হাসিমুখে বাইরে এলেন। আর সেই মুহূর্তে একটা জোর গলার চেঁচানি শোনা গেল কাছেই কোথাও। তিনজনেই চমকে ঘুরে তাকালেন, যেদিক থেকে চেঁচানিটা আসছিল। কাছাকাছি কেউ কোথাও নেই, তা হলে? আরও একবার শোনা গেল অস্পষ্ট ভাষার জোর গলার আওয়াজ। যেন কেউ শাসাচ্ছে কাউকে। ওই তো, হলুদ বাড়ির দোতলা থেকেই আসছে গলার আওয়াজ। মনে-মনে খুব অপ্রস্তুত আর বিরক্ত হয়ে পড়লেন মাদাম ভেনেসা। এই নতুন ভাড়াটেটি সম্পূর্ণ উন্মাদ। একে ঘর ভাড়া দিয়ে উলটে তাঁর ঝামেলা বেড়েছে। ছি ছি!

খদ্দেররা কী যে ভাবছেন! আজ রাতে রেস্তোরাঁ বন্ধ করে বাড়ি ফেরার পথে একবার জানিয়ে দিয়ে আসতে হবে ভাড়াটেকে, এমন করলে এ বাড়িতে তার থাকা হবে না।

"আর একটা করে ওয়াইন নেবেন তো আপনারা?"

দেঁতো হাসি সহযোগে কথাটা বললেন মাদাম ভেনেসা, যখন আরও একবার শোনা গেল তাঁর উন্মাদ ভাড়াটের প্রবল রাগী গলা। তারপর, রাতের আবছা অন্ধকারে, শীতের প্রবল বাতাস আর ঝিরঝির বরফের মধ্যেই হলুদ বাড়ির সবুজ দরজা ঠেলে রাস্তায় নেমে এলেন পল। হাতে সুটকেসভরতি জামাকাপড় আর রং তুলি, যা তিনি বেরোবেন বলে গুছিয়েই রেখেছিলেন। যদি-বা ভেবেছিলেন আজকের রাতটা এখানেই থেকে যাওয়ার কথা, কিন্তু এরপর আর থাকা চলে না। আর একমুহূর্তও নয়। রাত ন'টায় শেষ ট্রেন ছুটে যাবে প্যারিসের দিকে। আপাতত সেইটা ধরবেন বলেই দ্রুত পায়ে হাঁটা লাগালেন তিনি।

৪

কলকাতা, নভেম্বর, ২০১৭

"এই এত ওষুধপত্র খেতে হবে এখন?"

বাচ্চার মতোই প্রশ্নখানা করল ঋত্বিক, যখন তার পাশের সিটে বসে গাড়ি চালাচ্ছে শর্মিলা। ছিপছিপে, বুদ্ধিদীপ্ত, সপ্রতিভ, চশমাপরা একজন মানুষ, যাকে নাকি এখন আর অতটা ঝলমলে দেখাচ্ছে না। শর্মিলা এই ৩৭-এ পা দিল গত মাসে, ডিসেম্বরে ৩৭ হবে ঋত্বিকের। আর সেইদিনই কিনা, মানে নিজের জন্মদিনে, ঋত্বিকের অসুখ দেখে একরকম হতবাকই হয়ে গিয়েছিল সে। মাস্টার্স করতে গিয়ে তাদের আলাপ হয় কলেজে, আর তখন থেকেই তারা পরস্পরের জন্মদিন ভালই জানে। কেননা উপহার দেওয়া নেওয়া তো চলতই, তা ছাড়া তারা যে নিজেদের ভালবেসে ফেলেছে, এটা বুঝে যাওয়ার পর যার-যার বাড়িতে নিমন্ত্রণও লেগেই থাকত। কিন্তু এ বছর ২৩ অক্টোবর, শর্মিলার জন্মদিন, একটু অন্যরকম ঘটনা ঘটল। সামান্য বড় এলোমেলো চুল, অল্প ছেঁটে জিইয়ে রাখা গোঁফ, দাড়ি, লম্বা জুলপি আর হাতে প্রিয়তম কফির মগটা নিয়ে ঋত্বিক বসে থাকল বারান্দায়।

"তুমি অফিস যাবে না আজ?"

পিছন থেকে এমনিই জিগ্যেস করেছিল শর্মিলা। সে ভেবেছিল হয়তো বা কোনও আশ্চর্য উপহারের পরিকল্পনা মাথায় নিয়েই ওইভাবে উদাসীন বসে আছে ঋত্বিক, যে কিনা একদিনও অফিস থেকে দূরে থাকা পছন্দ করে না। থাকা অবশ্য সম্ভবও নয়, কারণ নামজাদা বিজ্ঞাপন সংস্থার সে আপাতত দ্বিতীয় দায়িত্বপূর্ণ মানুষ। তার মাসমাইনে ও ঝুঁকি, দুটোই খুব বেশি। আর তার চাইতেও যা বেশি তা হল এই কাজটার প্রতি ঋত্বিকের ভালবাসা। সে মনে করে, হোক বিজ্ঞাপন, তবু তার মধ্যে দিয়ে কিছু না কিছু তৈরি করার একটা সুযোগ তো থেকেই যাচ্ছে। শর্মিলা অবশ্য সরকারি একটা ব্যাঙ্কে চাকরি করে, যদিও তার ইচ্ছে ছিল কলেজে পড়ানোর। তা সেইদিন, মানে সেই ২৩ অক্টোবর, শর্মিলাও কাজে বেরোচ্ছিল, তার আগেই এই প্রশ্ন করা।

"তুমি অফিস যাবে না আজ?"

"হুম?"

"বলছি যে, অফিস যাওয়া নেই?"

"অফিস যেতে হবে?"

"যেতে হবে না বুঝি?"

"তা তো জানি না।"

এই কথোপকথন যখন চলছে, তখন ঋত্বিক তাদের বছর দু'-এক আগে কেনা বহুতলের ২৫ তলার একটি অ্যাপার্টমেন্টের বারান্দার চেয়ারে বসে তাকিয়ে আছে বাইরের দিকে, আর শর্মিলা দাঁড়িয়ে আছে তার পিছনে, লিভিং রুমের ঠিক মাঝখানটায়। ফলে, কেউ কারও মুখ দেখতে পাচ্ছে না। পেলে শর্মিলা অন্তত বুঝত, ঋত্বিক ঠিকঠাক তার কথা বুঝে তবে উত্তর দিচ্ছে, এমনটা নয়। তার চোখের চাউনি দেখলেই শর্মিলা জানতে পারত, লোকটা বদলাতে শুরু করেছে।

"জানি না মানে? কী হেঁয়ালি করছ?"

"আমি কি ছুটির সময়ে অফিস যাই?"

এই প্রশ্নটায় শর্মিলা বারান্দায় বেরিয়ে ঋত্বিকের মুখোমুখি গিয়ে দাঁড়াল।

"কী হয়েছে বলো তো তোমার? আজ ছুটি নিয়েছ? সিরিয়াসলি?"

"তা ছুটি নিয়েই তো এখানে এলাম। স্নান করতে যাবে না?"

"স্নান করতে? মানে? স্নান করেই তো বেরোলাম এক্ষুনি।"

"তুমি না... এখানে এসে কেউ বাথরুমে স্নান করে? ওই দ্যাখো, এই সকালেই কত লোক নেমে পড়েছে..."

শর্মিলা খুব চিন্তিত মুখ নিয়ে সামনে তাকাল। সামনের হাইরাইজ়দুটো দেখা যাচ্ছে, যেমন রোজ দেখা যায়, নীচে কয়েকজন বাসিন্দার স্বাভাবিক আনাগোনা। ঋত্বিক কী দেখছে?

অন্য কেউ হলে হয়তো এ সময়ে অভিমানী হয়ে উঠত, কিন্তু শর্মিলা তেমন মানুষ নয়। সে বরাবর শান্ত আর ধীরস্থির হয়ে বুঝেসুঝে সব বিষয়ের সামনে দাঁড়াতে পছন্দ করে।

"তুমি কী দেখছ, ঋত্বিক?"

ঋত্বিক তখন খুব আবছা হলেও দেখতে পাচ্ছে ঢেউয়ের ঝাঁপ উপহার দেওয়া উত্তাল এক সমুদ্র আর তার সামনের বালিতে পেতে রাখা লাল চেয়ারের গুচ্ছ। সে দেখতে পাচ্ছে তোয়ালের পাশে চটি ছেড়ে রেখে পর্যটকদের স্নানে নেমে যাওয়া, আর কিছু মানুষের

শামিয়ানা খাটিয়ে বসে থাকা। সমুদ্রের নোনতা গরম হাওয়া এই তার গায়ে লাগছে। শর্মিলা কাঁধে হাত দেওয়ায় একটা উঁচু ঢেউ হঠাৎ উঁচু হতে-হতে হাইরাইজ় হয়ে গেল।

"ওহ! আমরা পুরী আসিনি?"

এই উত্তরটায়, মনে আছে শর্মিলার, বেশ ভয় পেয়েছিল সে। সেদিন খুব স্বাভাবিকভাবেই ব্যাঙ্কে যাওয়া বাতিল করতে হয়েছিল শর্মিলাকে। এ যে ডাক্তারকে জানানোর মতোই ব্যাপার, তা নিয়ে আর কোনও সন্দেহই ছিল না তার মনে। খুব শান্ত, ধীরস্থির শর্মিলাও সেদিন ভয় পেতে শুরু করেছিল।

এক-দু'জন ডাক্তারের সঙ্গে সেই থেকেই কথা বলছে শর্মিলা, শেষে রুখসারের কথা মনে পড়ায় আজ প্রথম ঋত্বিককে নিয়ে ডাক্তারের চেম্বারে এল তারা। এমনিতে সামান্য জ্বর বা পেটব্যথা হলে ঋত্বিক পাত্তা দেবার লোক নয়। তাই নিয়েই সে রোজ অফিস যায়। কিন্তু এই অসুখটা তাকে ক্রমাগত কেমন যেন অলস করে দিচ্ছে। ঠেলেঠুলে অফিস পাঠাতে হচ্ছে আর চিন্তায় থাকতে হচ্ছে এই নিয়ে, অফিসের লোকজন কী ভাববে। বা তার চেয়েও বড় কথা, এমন দায়িত্বের পদে এই অসুখ নিয়ে কাজ করা যায় কিনা।

সেই থেকে অবশ্য ড্রাইভিং হুইলে বসাও বন্ধ ঋত্বিকের। যেখানেই যেতে হোক, শর্মিলা চালিয়ে নিয়ে যায়। আর ঋত্বিকের অফিসে বলে সহজেই একটা পিক আপ অ্যান্ড ড্রপের ব্যবস্থা হয়েছে। যদিও অফিস আর ক'দিন সে যেতে পারবে, এ নিয়ে সংশয় আছে শর্মিলার। তেমন হলে রুখসারের কাছ থেকে লিখিয়ে নিয়ে তাকে কথা বলতে হবে ঋত্বিকের অফিসে।

ক্যামাক স্ট্রিটের দীর্ঘ সিগন্যালে যখন গাড়িটা দাঁড়িয়ে, তখন প্রশ্নটা করল ঋত্বিক।

"এই এত ওষুধপত্র খেতে হবে এখন?"

পাশের গাড়িতে যে-ভদ্রলোক বসে, তাঁর রাত সাড়ে বারোটায় হংকং-এর ফ্লাইট ধরার কথা। বারবার ঘড়ি দেখছেন তিনি। একটু দূরে, পার্ক সার্কাসের এক গ্যারাজে পার্টস চুরির দায়ে বরখাস্ত হচ্ছে এক কমবয়সি ছোকরা মেকানিক, যার কিনা কাজটার খুবই দরকার ছিল এখন। সে বাড়ি গিয়ে কী বলবে এইটাই ভেবে না পেয়ে রাস্তায় বসে আছে চুপচাপ। উলটোদিকে একখানা গির্জা, এখন অন্ধকার। সন্ধেবেলাই আজ সেখানে হয়ে গিয়েছে নিয়মমাফিক প্রার্থনা, যেখানে এক বৃদ্ধা মোম জ্বালিয়ে নিজের মৃত্যু চেয়ে গিয়েছেন যিশুর কাছে। তাঁর আর বেঁচে থাকতে ভাল লাগছে না। গঙ্গার ওপার থেকে একটা হাওয়া ঢুকে আসছে শহরে। মফস্‌সলের সামান্য ঠান্ডা হাওয়া। কী তার মতলব, কেউ জানে না। সে হাওয়ার ধাক্কায় কিছু পাতা উড়ছে, কয়েকটা শুকনো পাতা উড়ছে পার্ক স্ট্রিট সেমেটরির ভিতরেও, যেখানে কেবল পাতারাই কথা বলে। সারাক্ষণ।

সিগন্যাল ছাড়ল এবার।

"খেতে তো হবেই ঋত্বিক। না খেলে এটা বাড়তেই থাকবে। সেটা তো হতে দেওয়া যায় না। বাই দ্য ওয়ে, ক'দিন ছুটি নাও না? পাবে না চাইলে?"

"হ্যাঁ, তা হয়তো পাব, কিন্তু ডিসেম্বরে একটা বড় ক্যাম্পেন শুরু হচ্ছে। তার ফাইনাল আর্ট ওয়র্ক চলছে। এই সময়ে ছুটি নেওয়াটা একটু চাপের।"

গাড়িটা থার্ড গিয়ারে ফেলে শর্মিলার মনে হল, এই মুহূর্তে পাশের মানুষটাকে কী চেনাই না লাগছে। যেন কোনও হ্যালুসিনেশন নেই, আলস্য নেই। কিন্তু সে জানে, এটা পুরনো ঋত্বিক। যে এখনও জলের তলা থেকে হাত তুলে জানান দিচ্ছে তার ডুবে যাওয়া।

"তা-ও, দেখো না কথা বলে। ক'টা দিন না-হয় বাড়িতেই রেস্ট নাও। বা চাইলে ক্রিসমাসের ছুটিতে কাছাকাছি কোথাও যেতেও পারি।"

"নট আ ব্যাড আইডিয়া অ্যাট অল। ও কে, আমি দেখব কথা বলে।"

এরপর বেশ কিছুক্ষণ কেউ আর কোনও কথা বলেনি গাড়িতে। রেডিয়ো চলছিল। তাতে পরপর তিনটে গান বাজল, যার মধ্যে একমাত্র 'মাশুকা তুম হো' গানটি শোনা যেতে পারে। তারপর হলিউডের ছবি 'দ্য ট্রু মেন'-এর রিভিউ মজা করে বললেন এক রেডিয়ো জকি, আর তিনি মোটেই শ্রোতাদের ছবিটি দেখতে যাওয়ার উৎসাহ দিতে চাইছেন না।

গাড়িটা গড়িয়াহাট ফ্লাইওভার থেকে গোলপার্কের দিকে নামবে, এমনই সময়ে ঋত্বিক হাত তুলে রীতিমতো চেঁচিয়ে উঠল।

"গাড়ি ঘোরাও, ঘোরাও! খাদ! খাদ সামনে শর্মিলা!"

শর্মিলা এমন কোনও ঘটনার জন্য প্রস্তুত ছিল না। তার হাত একটু হলেও নড়ে গেল। পাশে সেইমুহূর্তে কোনও গাড়ি থাকলে মাঝারি রকমের একটা ধাক্কা লেগেই যেতে পারত। কোনও রকমে মাথা ঠান্ডা রেখে ফ্লাইওভার থেকে নেমে এসে বাঁদিকে গাড়ি দাঁড় করাল শর্মিলা। গড়িয়াহাট থেকে তখন ট্র্যাফিকের হু-হু স্রোত বয়ে চলেছে সামনের দিকে। ঋত্বিক তখনও একটা বাচ্চা ছেলের মতোই দু'হাত দিয়ে ঢেকে রেখেছে নিজের চোখ।

"চোখ খোলো। কী দেখলে তুমি, বলো? এটা কিন্তু গোলপার্ক। তুমি চেনো এ জায়গাটা।"

"আমি তো গান শুনছিলাম চোখ বন্ধ করে। খুলতেই দেখি গাড়িটা নেমে যাচ্ছে রাস্তা থেকে খাদে। একপাশে পাহাড় আর উঁচু-উঁচু গাছ। সামনে খাদ। আর দু'সেকেন্ড এভাবে চললে গাড়িটা পড়ে যেত।"

"এটা দেখলে তুমি?"

“এক্ষুনি দেখলাম। সামনে থেকে।”

শর্মিলা একবার হেলান দিল ভাল করে। তার ঘাড় ব্যথা করছে। চোখ বুজল একবার। চোখ বুজেই সে দেখতে পেল, সামনে একটা খাদ আসছে।

৫

দ্য ইয়েলো হাউস, আর্ল, ফ্রান্স
ডিসেম্বর, ১৮৮৮

একটিমাত্র মোমের আলোয় ঘরের মধ্যে দাঁড়িয়ে কাঁপছেন ভিনসেন্ট। ঘরের দুটো জানলাই খোলা, যারা বয়ে আনছে উত্তরের কনকনে বাতাস, এই রাত সাড়ে আটটার সময়ে। কিন্তু ভিনসেন্ট সেই কারণে কাঁপছেন না। সত্যি বলতে কী, এই এত ঠান্ডা তিনি বোধই করছেন না কোনওভাবে। তাঁর সমস্তরকমের বোধ এখন গিয়ে ঠেকেছে একটি চূড়ায়। আর সে-চূড়া হল ক্রোধের। অনেক অনুভূতিকেই হাতে ঠিকঠাক খেলাতে পারেন না ভিনসেন্ট। কোনও দিনই পারেননি। আর পারেননি ক্রোধকে সামাল দিতে, লাগাম পরিয়ে রাখতে।

এখন অসম্ভব এক রাগে সারা শরীর কাঁপছে তাঁর, আর তিনি নিজের সেই কম্পমান ছায়া দেখতেও পাচ্ছেন বাড়ির দেওয়ালে। কেন এত রেগে গেলেন হঠাৎ? মনে করতে পারছেন না কিছুতেই। যদি বা খুব সামান্যই চাইছেন তিনি তা মনে করতে, তবু, সেটুকুও পারছেন না। কারণ তাঁর মস্তিষ্কের, মননের সবটুকু, প্রায় সবটুকু এখন ছুটে চলেছে ওই ফুটন্ত রাগের কড়াইয়ের দিকে। একটু আগে কি খুব জোরে চেঁচিয়ে উঠলেন তিনি? মনে হচ্ছে যেন। হ্যাঁ, চেঁচালেনই তো। কিন্তু কার উপর চেঁচালেন এত? কেউ তো নেই ঘরে? নিজের শরীরটাকে কোনও মতে দাঁড় করিয়ে রাখতে-রাখতে তাঁর খেয়াল হল, থাকবেই বা কী করে কেউ! এই তো মিনিট কয়েক আগে বাড়ি ছেড়ে বেরিয়ে গেল পল। থাকতেই এসেছিল সে, কিন্তু বেরিয়ে গেল। কারণ ভিনসেন্ট তাকে শাসিয়েছেন।

তিরতির করে কাঁপতে থাকা ডান হাতের দিকে এবারে চোখ গেল ভিনসেন্টের। মোমের আলো লেগে মাঝে-মধ্যেই যেখানে ঝিলিক দিয়ে উঠছে একখানা খোলা ক্ষুর। প্যারিসের বাজার থেকেই দরদাম করে কিনেছিলেন ভিনসেন্ট ক্ষুরটা, মাঝেমধ্যে গোঁফদাড়ি চাঁছতে সুবিধে হয় বলে। কিন্তু সেই ক্ষুর যে এমন বেয়াদব হয়ে উঠবে, তা কে জানত?

এই রাগের মধ্যেই ভিনসেন্টের আস্তে-আস্তে মনে পড়ে যাচ্ছে কী-কী হয়েছিল। আবছা মনে পড়ছে, কারণ তাঁর চোখের দৃষ্টি এখন ঘোলাটে, অন্তর্দৃষ্টিও ঝাপসা। তবু, কী এক কারণে যেন তর্ক বেধে যায় বন্ধু পলের সঙ্গে। ছবি নিয়েই কি কথা হচ্ছিল? নাকি প্যারিস

নিয়ে? নাকি নেহাতই খুচরো কোনও বিষয়, যার তেমন কোনও মানেই হয় না? ঠিক মনে পড়ছে না ভিনসেন্টের। কেবল মনে পড়ছে, হঠাৎ করেই উত্তেজিত হয়ে উঠেছিলেন তিনি। কোনও কথাই আর শুনতে চাইছিলেন না পলের মুখ থেকে। কারণ সেই তর্কের মধ্যেই পল জানিয়ে ফেলেছিল তার প্যারিস ফিরে যাওয়ার মতলবের কথা। তারপর তেমন কিছু মনে নেই আর। হ্যাঁ, পল তাঁকে বোঝাবার, শান্ত করার চেষ্টাও করছিলেন বটে, এখন সেইরকমই মনে পড়ছে ভিনসেন্টের। কিন্তু কারও কথা শোনার মানুষ তিনি নন। ছিলেনও না কোনও দিন। এরপর, পলেরও ধৈর্য চলে যেতে থাকে এক সময়ে। যখন নাকি পাশের টুকটাক জিনিসের দোকানটা বন্ধ হচ্ছে আর একখানা ট্রেন বেরিয়ে যাওয়ার শব্দ ঢুকে পড়ছে জানলা দিয়ে।

"শোনো, তুমি আমার কথা শোনো একবার," বলে উঠেছিল পল। কিন্তু ততক্ষণে পোষ না মানা, হিংস্র, ছিঁড়ে খাওয়া সেই রাগ চড়ে বসেছে ভিনসেন্টের মাথায়। তাঁর কানে ফিসফিস করছেন স্বয়ং শয়তান। বলছেন, "দেরি করিস না, ক্ষুরটা তুলে নে। খোল। তারপর চালিয়ে দে।" ভিনসেন্টের স্পষ্ট মনে পড়ছে এখন, এ কথা তিনি অবশ্যই শুনতে পেয়েছেন কানে-কানে। শয়তানের অমোঘ বাক্য। তাকে না যায় পালন করা, না যায় অবহেলা করা।

তাই কাঁপা-কাঁপা হাতে ক্ষুরটা তুলেই নিয়েছিলেন ভিনসেন্ট। সেই কম্পন দ্বিধার নয়। ক্রোধের।

দৃশ্যটা কিছুতেই বিশ্বাস হচ্ছিল না বন্ধু পলের, যিনি নাকি একটু আগেই ডিনারের খাওয়া-দাওয়া সম্পর্কে একটা মিলিত সিদ্ধান্তে আসতে চাইছিলেন। তার আধ ঘণ্টার মধ্যে আঁকিয়ে বন্ধুর হাতে খোলা আর ধারালো একখানা ক্ষুর উঠে এলে সে-ঘটনা অবিশ্বাস্যই বই কী।

এতেও যথেষ্ট হয়নি। এমনটাই ভেবে অবিশ্বাস আর আস্থা, দুটো নিয়েই আর এক পা এগিয়ে এসেছিল পল, এখন মনে পড়ছে ভিনসেন্টের। সে নিশ্চয়ই বোঝাতে আসছিল আরও কিছু কথা, কিন্তু ততক্ষণে বোধের বাইরে চলে গিয়েছেন ভিনসেন্ট খোদ। একটাই বোধ কাজ করছে। অপার্থিব, অলৌকিক এক ক্রোধ, যার কোনও দিগন্ত তিনি দেখতে পাচ্ছেন না কোনও দিকেই।

ক্ষুরটা দিয়ে ছাঁৎ করে একবার বাতাস কেটে ফেরত আনলেন ভিনসেন্ট। পলের জামার বোতাম ঘেঁষে বেরিয়ে গেল সেই ক্ষুর। মুখে কী বলছিলেন তখন ভিনসেন্ট? অশ্রাব্য গালিগালাজ? নাকি সরাসরি খুনের হুমকি? এখন কাঁপতে-কাঁপতে ভাল মনে পড়ছে না ভিনসেন্টের। কেবল মনে পড়ছে আর কয়েক সেকেন্ড মাত্র দাঁড়িয়েছিল পল। এই আস্থায়

যে, ভিনসেন্ট নিশ্চয়ই শান্ত হয়ে আসবেন। কিন্তু পলের সেই দাঁড়িয়ে যাওয়া দেখেই ক্ষুর হাতে আরও দু'পা সামনে এগিয়ে যান ভিনসেন্ট। শয়তানের কথা তিনি অর্ধেক শুনছেন। পুরো নির্দেশ পালন করলে এতক্ষণে ইউরোপের সেরা একজন আঁকিয়ের রক্তাক্ত দেহ পড়ে থাকত তাঁর মেঝেয়। ওই দু'পা এগিয়ে যাওয়ার পর আর দাঁড়াননি পল। ঘরের কোণে শুইয়ে রাখা বন্ধ সুটকেসখানা তুলে সিঁড়ি দিয়ে নেমে গিয়েছেন। এই তো, একটু আগেই দরজা খোলা আর বন্ধ হওয়ার শব্দ পেয়েছেন ভিনসেন্ট। প্রাণের বন্ধুকে খুনের হুমকি দিয়ে বহিষ্কার করে দিতে সফল হয়েছেন তিনি। খুশি তো, শয়তান?

ভিনসেন্ট এক আগ্নেয়গিরির মুখের মধ্যে দাঁড়িয়ে আছেন, যা বহু বছর ঘুমন্ত থাকার পর আজ, এই একটু আগেই জেগে উঠেছে। এত এত বছরের ঘুম জমিয়ে সে তৈরি করেছে লাভা, যা আজ চারপাশের, এমনকী বহু দূরের অনেক কিছু ভস্মে পরিণত করবে মুহূর্তেই। তবে তার আগে তাকে পেরিয়ে যেতে হবে জ্বলন্ত ভিনসেন্টকে। ক্রেটারের মধ্যে পা রাখলেন ভিনসেন্ট, সার্কাসের পাকা বাজিকরের মতো উত্তপ্ত পাথরে পা রেখে উল্লম্ব ভাবেই নেমে যেতে লাগলেন আগ্নেয়গিরির পেটের মধ্যে। হাতে খোলা ক্ষুর, মাথার মধ্যে অজস্র স্ফুলিঙ্গ পরস্পরের চারপাশে ক্রমাগত ঘূর্ণায়মান। মুখ ঝলসে যাচ্ছে আঁচে, কান বন্ধ হয়ে আসছে গরম হাওয়ায়। কিন্তু ভারী শীত করছে তাঁর। লাভা কি বরফ দিয়ে তৈরি? শয়তানকে জিগ্যেস করেও কোনও উত্তর পেলেন না ভিনসেন্ট। মুখ তুলে তাকাচ্ছেন না। তাঁর নীল ঝকঝকে চোখদুটো এখন স্থির হয়ে আছে আগ্নেয়গিরির গর্ভে, যেখান থেকে উঠে আসছে লাভা। উপরে তাকালে দেখতে পেতেন, আকাশ লালচে গোলাপি হয়ে গিয়েছে এক আশ্চর্য আগুনের আঁচে। আর তাঁর পোষ না মানা ক্রোধ বিরাট এক শরীর নিয়ে আছড়ে বেড়াচ্ছে গোটা আকাশ জুড়ে। আজ তার রাত এসেছে।

শরীরে কোনও অসুবিধে নেই, কিন্তু আগুনের এই চটাপট শব্দ, লাভার ধাক্কায় পাথর ফাটার এই চড়মড়াৎ অসহ্য আওয়াজ তিনি আর সহ্য করতে পারছেন না কিছুতেই। এ যেন তাঁর ক্রোধকেও ছাপিয়ে যেতে চায়। কিন্তু ভিনসেন্ট জেদি। কারও কাছে, কিছুর কাছে হার মানবেন না তিনি। শয়তানের কাছেও না, ঈশ্বরের কাছেও না। কেবল নিজের ইচ্ছে তাঁকে চালনা করবে। এই যেমন স্বেচ্ছাতেই, কেবল ওই আওয়াজটাকে উচিত শাস্তি দেবেন বলেই হাতের ক্ষুরটা তুলে নিচ্ছেন বাঁ দিকের কানের গোড়ায়, যেখান থেকে আওয়াজটা আসছে। এইবার শান্তি।

তোমার মধ্যে নিয়ে তুমি জন্মেছ
আগুন পুড়িয়ে ফেলবার এক নক্ষত্র। চিরকালীন।
যা ঘুরতে থাকে আর কাটতে থাকে অবাধ্য ফুলকিদের

যার ঘূর্ণনকে এড়িয়ে চলেন স্বয়ং দেবদূতরাও।
তুমি নিয়ে জন্মেছ সেই নক্ষত্রকে।
সে কখনও থাকে আকাশে, যখন গম কাটা হয়ে যাবার পর
নিরীহ মাঠ অপেক্ষা করে কোনও অপরাধের,
তখন বাড়িঘর খেতখামার আর গাছপালার
অনেক উপরে
করাতের চাকার মতোই ঘুরতে থাকে সে।
তোমার মধ্যেকার আগুন কেটে কেটে আকাশে ওড়াতে থাকে ফুলকি
যাদের, মানুষ, এত নীচ থেকে,
ছায়াপথ বলেই মনে করে।
তুমি, আর তোমার নিয়তি, ঘুমোবে না কোনও দিন।
কেননা আগুন তোমাদের ছেড়ে যাবে না কোথাও।

যে-কোনও আগ্নেয়গিরিই আসলে এক সুড়ঙ্গ। অশান্তির দিক থেকে শান্তির দিকে যা বয়ে চলে। এটুকু আজ রাতে বুঝলেন ভিনসেন্ট। তাঁর শরীরের কম্পন থেমেছে, কারণ তিনি এখন আগ্নেয় সেই সুড়ঙ্গের এপাশে, দাঁড়িয়ে আছেন এক দরজার সামনে। তাঁর রক্তমাখা ডান হাতকে তিনি দেখতে পাচ্ছেন, অনবরত সেই বন্ধ দরজায় জোরদার ধাক্কা দিতে। তারপর দেখতে পাচ্ছেন চড়া সাজের এক কমবয়সি মেয়েকে দরজা খুলে হাসিমুখে তাকাতে, এই মহল্লায় যার পরিচয় গণিকা বলেই। কী নাম যেন মেয়েটির? এই শীতে মনে করতে পারলেন না ভিনসেন্ট। গণিকাদের নাম এক খদ্দের থেকে আরেক খদ্দেরে পালটাতে থাকে, তারপর এইভাবে তারা একদিন ফিরে আসে নিজের পুরনো নামে। মনে হল ভিনসেন্টের। তাঁর মুখেও হাসি, প্রশান্তির। ভিনসেন্ট দেখলেন, তাঁর রক্তমাখা ডানহাত মেয়েটির দিকে এগিয়ে যাচ্ছে, সেখানে কাগজে মোড়া এক উপহার। অশান্তির শ্রবণ তিনি উপহার দিয়ে দিচ্ছেন মেয়েটিকে। এই সেই কান, যেখানে মুখ রেখে শয়তান ফিসফিস করেছে এতদিন। বন্ধুকে বাঁচালেন ভিনসেন্ট। শাস্তি দিলেন শয়তানকে।

৬

নভেম্বরের শেষ, কলকাতা
২০১৭

এই সময়ে, মানে এই নভেম্বরের শেষাশেষি, মনে আছে শর্মিলার, বেশ উপভোগ করার মতো শিরশিরে একখানা ঠান্ডা শুরু হয়ে যেত কলকাতায়। যখন সব উৎসব শেষ হয়ে গিয়েছে আর খুলে গিয়েছে স্কুলগুলো, যখন সামনে নানান খুশি নিয়ে অপেক্ষা করছে বড়দিন, তখন। স্কুল থেকে বাড়ি ফেরার পর, হোমটাস্ক করা শেষ হয়ে গেলে যখন অর্ক বা রাজন্যাদের বাড়ি যাবার জন্যে রোজই বেরোত শর্মিলা, তখন হালকা একটা সোয়েটার বা নিদেনপক্ষে পঞ্চু তো লাগতই। আর বাড়ি থেকে বেরোলেই সে দেখতে পেত, খুব মিহি একটা হিমের চাদর কখন কে জানে ঘিরে ফেলেছে তাদের ছোট্ট পাড়াটাকে। যেন-বা আগলেই রেখেছে অনেক কিছু থেকে।

এ কথা মনে করবার কারণ অবশ্য এই যে, গত কয়েক বছর ধরে শীত শুরু হতে হতে বহু দেরি হচ্ছে। এই যে আজ দুপুরে থিয়েটার রোডের এই ক্যাফেটায় এসেছে শর্মিলা, তার জুতসই একটা রোদচশমা লেগেছে, যা এখন নামানো আছে টেবিলের উপর। শুধু তা-ই নয়, পাশের রাস্তায় গাড়ি পার্ক করে হেঁটে আসতে-আসতে সে রীতিমতো ঘেমেই উঠেছিল। এখন যান্ত্রিক ঠান্ডায় যথেষ্ট আরামই হচ্ছে তার। কলকাতায় বরফ পড়ার যে-আজগুবি দৃশ্য ঋত্বিক একবার দেখেছিল, এখন মনে হল শর্মিলার, অলীক হলেও তা মন্দ ছিল না।

রুখসার ঠিক কাঁটায়-কাঁটায় দুটোয় এলেন। সময় দিয়ে তা না-রাখা রুখসারের পছন্দ নয়।

"এখানে কিন্তু খুব ভাল ক্লাব স্যান্ডউইচ করে। ট্রাই করতে পারো। আর ফিশ অ্যান্ড চিপস-ও খুব ভাল। আমার তো বেশ খিদে পেয়েছে।"

রুখসারের বলে দেওয়া এই ক্যাফেটায় আগে কখনও ঢোকেনি শর্মিলা। বাইরে থেকে সম্ভ্রান্ত দোকানটাকে দেখেছে অনেকবার, আজ এই প্রথম আসা তার।

"ক্লাব স্যান্ডউইচ একটা আমার জন্যে। আর একটা আমেরিকানো।"

কত দিন পর কালো কফির অর্ডার দিল শর্মিলা। ঋত্বিকের এই নেশা বহুদিনের। সেটা বেড়ে যায় যখন সে লন্ডনে একটা ওয়র্কশপ করতে গিয়েছিল মাস ছয়েকের জন্যে। তারপর দিনে বারতিনেক কড়া, ভাল, কালো কফি না হলে তার চলে না। আজ কেন কে জানে, একটা কফির ইচ্ছে শর্মিলাকে পেয়ে বসল। মুখোমুখি বসেছেন রুখসার, আলগা একটা ভরসার হাসি আছে কোথাও যেন। এখন এই মানুষটির উপর তার আর ঋত্বিকের ভবিষ্যতের অনেকটাই নির্ভর করছে।

"কেমন আছে এখন?"

"এমনিতে তো খুবই নর্ম্যাল মনে হচ্ছে। যখন হ্যালুসিনেট করছে তখন ছাড়া। আর মাঝে-মধ্যে অদ্ভুতভাবে এমন সব কথাবার্তা বলছে... সেটা অবশ্য সব সময়ে ক্রস চেক না করলে টেরও পাওয়া যাচ্ছে না।"

"অফিস করছে?"

"গত দু'দিন তো একেবারে নর্ম্যালি করেছে। আজও অফিস গেল সকালে। দেখে কিছু বোঝাই যাচ্ছে না। আমি অবশ্য জানি না, অফিসে কিছু ঘটেছে কিনা বা কেউ জেনেছে কিনা। জিগ্যেস করতে ভরসা পাচ্ছি না।"

"দ্যাটস ওকে, এক্ষুনি দরকার নেই। ঘুম হচ্ছে?"

"হ্যাঁ, ওষুধগুলো দেবার পর থেকে হচ্ছে। তাই রাতে আর ভুলভাল কিছু দেখছে না।"

"দ্যাখো শর্মিলা, হ্যালুসিনেশন কিন্তু স্ট্রেস থেকেও আসতে পারে। আজকাল অনেকেরই এটা হচ্ছে, স্পেশ্যালি যারা নানারকমের লোড নেয়। যদি রেগুলার বেসিসে এটা চলতেই থাকে, তা হলে আমরা অনেক সময়ে পেশেন্টের পাস্ট, মানে অতীত জানার চেষ্টা করি। কারণ, ইউ সি, এই যে একজন নানা দৃশ্য দেখছে, যার কিছুটা ডিস্টার্বিং, কিছুটা হয়তো আরামদায়ক, এর সঙ্গে কিন্তু অনেক সময়ে অতীতের কিছু ঘটনার যোগ থাকতে পারে। আই মিন টু সে, এমন কোনও ঘটনা বা দুর্ঘটনা, যা থেকে পেশেন্ট খুব বড় রকমের শক পেয়েছে। যেটা সে ক্যারি করেছে ভিতরে-ভিতরে। বোঝাতে পারছি? এই ধরনের শক বা আঘাত কিন্তু অনেক সময়ে ব্যালান্সের অভাব তৈরি করে। তার উপর পেশেন্ট যদি ওভার-ইম্যাজিনেটিভ হয়, কোনও-কোনও বিষয়ে অবসেসিভ হয়, তা হলে আ ডিজ়অর্ডার ক্যান সেট ইন। আমি বলছি না এখনই অতটা হয়েছে, বাট আমার যেটা অদ্ভুত লাগছে সেটা হল..."

দুটো সাদা ধবধবে প্লেটে দু'সারি ক্লাব স্যান্ডউইচ রেখে গেলেন একজন। সঙ্গে একটা ক্যাপুচিনো, একটা আমেরিকানো। রুখসারের সত্যিই খিদে পেয়েছিল। বাকি কথাটা শেষ না

করেই তিনি একখানা স্যান্ডউইচে তৃপ্তির কামড় বসালেন। শর্মিলার খুব যে খেতে ইচ্ছে করছে এমনটা নয়, সে বরং চুমুক লাগাল কালো, কড়া কফিতে।

"আচ্ছা, তোমরা ফ্যামিলি প্ল্যান করেছ কখনও?"

"না, ইন ফ্যাক্ট, আমি ভাবছিলাম এ বছরই... কিন্তু..."

"তা ছাড়া? বাকি সব কিছু? কোনও পার্টিকুলার ব্যাপার, যা নিয়ে ঋত্বিকের ফ্রাস্ট্রেশন তৈরি হয়ে থাকতে পারে? এরকম কিছু? সেন্স অফ ইনকমপ্লিশন?"

"একটা ফ্রাস্ট্রেশন ভিতরে-ভিতরে কাজ করে ঠিকই। আমি জানি। হি ওয়ান্টেড টু বি আ পেইন্টার। অল দ্য ওয়ে। ছবি আঁকতে চেয়েছিল ও।"

"ওকে, মেকস সেন্স। হিয়ার কামস ইন 'দ্য স্টারি নাইট'। তা, সেটা হল না কেন?"

"বাড়ির প্রেশার। ও খুব ঝামেলা পছন্দ করে না। তা ছাড়া, সত্যি-সত্যি এঁকে রোজগারটা আমাদের দেশে আর ক'জনই বা করেন। এটা ঠিক, ওর মধ্যে সেই সাহসটা হয়তো ছিল না, সব ছেড়েছুড়ে রিস্ক নেওয়ার। যখন কলেজে আমার সঙ্গে আলাপ, মাঝে-মধ্যেই খুব ডিপ্রেসড থাকত। সবে-সবে আর্ট কলেজ ছেড়ে এমবিএ জয়েন করেছে তখন। আমি চেষ্টা করতাম ওকে বুস্ট আপ করতে, বলতাম আর্ট কলেজে ফিরে যেতে। কিন্তু সেটার জন্যও একটা জোর লাগে। ওর সেটা নেই। ফলে হি গট হিমসেল্‌ফ ডিভাইডেড ইনটু টু পার্টস। একজন, যে শিল্পী হতে চায়, আর একজন, যে সিকিওর হতে চায়। দ্বিতীয় সত্তাটাই ইভেনচুয়ালি জিতে যায়। কিন্তু আমি জানি, আজও ও একটা ফ্রাস্ট্রেশন বয়ে বেড়ায়। ও নিজেকেই দায়ী করে ওর শিল্পী হতে না পারার জন্যে। অ্যান্ড, আনফরচুনেটলি, দ্যাটস দ্য বিটার ট্রুথ।"

"হুম। এটা অবশ্যই খুব জরুরি একটা ব্যাপার। এই হতাশা কাটিয়ে উঠতে না পারলে ভিতরে-ভিতরে একেবারে রুটেড হয়ে যায়। আর আঘাত? এনি কাইন্ড অফ মেজর শক?"

শর্মিলা কফিটা শেষ করল। তার খিদে একেবারে মরে গিয়েছে। সে জানত এই প্রশ্নটা আসবে এবং তার উত্তর দেওয়াটাও জরুরি। সে শুরু করল,

"হ্যাঁ, আছে। আগের দিন ও সঙ্গে ছিল বলে বলা হয়নি। কিন্তু এটা শুনলে তুমি হয়তো বুঝতে পারবে যে..."

শর্মিলার কথার উপর দিয়েই ক্যাফের ছোট্ট-ছোট্ট সাউন্ডবক্স জুড়ে বেজে উঠল স্যাক্সোফোন। কেনি জি 'ব্রেথলেস' অ্যালবাম থেকে। এই বাজনার মধ্যে এক বিশেষ ধরনের সামুদ্রিক বাতাস আছে, যা এড়িয়ে যাওয়া যায় না কিছুতেই। সেই বাতাসে ভরে উঠল ক্যাফেটির সমস্ত কিছু। তার কাচের স্বচ্ছ গ্লাসের মধ্যে যত্নে মুড়ে ভরে রাখা সফেদ কাগুজে টিসুগুলোর গা দিয়ে বয়ে গেল সেই মোলায়েম বাতাস, এমনকী তারা ছুঁয়ে ফেলল

বহু পারদর্শিতায় মেপে শুইয়ে রাখা কাঁটা আর চামচগুলোকেও। চারিধারে সুতোর নকশা তোলা মেহগনি রঙের কাপড়ের ন্যাপকিনগুলি যেমন সেই বাতাসের স্পর্শ পেয়ে আরও একটু তরতাজা হয়ে উঠল, তেমনই টেবিলের পুরনো কাঠ ফিরে পেল প্রাণ। এই সেই বাতাস, এই সেই স্যাক্সোফোন। কিন্তু এরা কিছুতেই ছুঁতে পারল না তাদেরই স্রোতে আড়াল হয়ে যাওয়া শর্মিলার কথাগুলো, কফিতে আলগা চুমুক দিতে দিতে যা কিনা স্থির দৃষ্টি নিয়েই শুনে নিচ্ছিলেন রুখসার।

৭

বোর্ড রুম, জেমস ক্লিপ এজেন্সিজ়, রাজারহাট, কলকাতা
নভেম্বরের শেষ, ২০১৭

ওই একই সময়ে, যখন রুখসার আর শর্মিলার মধ্যে সংলাপ চলছে, ঋত্বিক তার অফিসের কাজ সামাল দিচ্ছে। সামনে যে বড় মাপের ক্যাম্পেন নিয়ে তারা সকলেই উদ্বিগ্ন হয়ে আছে, আজ তার ফাইনাল আর্ট ওয়র্ক প্রেজ়েন্টেশনের দিন। অফিসে সকাল থেকেই বেশ একটা হন্তদন্ত ভাব ছড়িয়ে-ছিটিয়ে আছে সেই কারণে। সত্যি বলতে কী, দিন দুয়েক হল আজগুবি ভাবনাগুলো আর জ্বালায়নি তেমন ঋত্বিককে। যদিও সে জানে যে তারা ছেড়ে দেওয়ার নয়, ঠিক সময় হলেই ফিরে আসবে। শুধু অফিসে না হলেই হল। তবে আর কয়েক দিনের মধ্যে একটা ছুটি চেয়ে নিতেই হবে তাকে। এই হেমন্তকালের কলকাতায় তার দম বন্ধ হয়ে আসে। সে চায় শীত। সাদা ধবধবে শীত, যা কিনা কোনও দিনই কলকাতা পর্যন্ত এসে পৌঁছোয় না। কোথায় যাবে ছুটি নিয়ে? সিকিম? শিমলা? মানালি? নামগুলো মাথার মধ্যে ঘুরছে ঋত্বিকের।

১৪ তলার কাচঘেরা বোর্ড রুমে সে-ই সকলের আগে ঢুকে এসেছে। বাকিরা লাঞ্চ সারছে এখনও, তারপর আসবে। এই ঘরখানা দিব্যি লাগে ঋত্বিকের। তারা এর চেয়েও উঁচুতে থাকে ঠিকই, কিন্তু বাড়ির বারান্দায় দাঁড়ালে আরও দুটো অ্যাপার্টমেন্ট দাঁড়িয়ে থাকে বাকি সব দৃশ্যকে ঢেকে দিয়ে। এখানে তেমন নয়। একদিকের দেওয়ালের গোটাটাই হার্ড গ্লাস। হঠাৎ তাকালে মনে হবে তিন দিকের দেওয়ালই আছে কেবল, একদিকটা খোলা। আর সেই কাচের ওপারে এদিককার শহরের অনেকখানি পর্যন্ত দেখা যায়।

একটা ফ্লাইওভার ওপাশ থেকে ছুটে এসে এপাশ দিয়ে বয়ে গিয়েছে। তার দু'ধারে ঋত্বিকদের অফিসের মতোই উঁচু-উঁচু বাড়ি, তারও ওদিকে, দিগন্তের আগে শুরু হয়ে যাচ্ছে ফাঁকা জমি। সেখানে এখনও প্লটিং চলছে, এরপর হয়তো বাড়ি উঠে যাবে একের পর এক। কিন্তু যতক্ষণ না উঠছে, ততক্ষণ দেখতে দিব্যি লাগে ঋত্বিকের।

কিন্তু বাকিরা এত দেরি করছে কেন? হ্যাঁ, বড্ডই দেরি করছে বাকিরা! কারণ ঋত্বিক সেই দুপুর থেকে অপেক্ষা করে আছে সকলের জন্যে, আর এখন, এই মুহূর্তে, রাত। ঘড়ি

দেখার পর চোখ তুলে কাচের দেওয়ালের দিকে তাকাতেই ঋত্বিক বুঝল, অনেকখানি বেশি অপেক্ষা করে ফেলেছে সে। আজ আর মিটিং হবে না।

সামনে রাত। নিথর, অবিচল, চিরকালীন রাত। খোলা উঁচু-নিচু জমিতে তারার আলো এসে পড়ে অল্পবিস্তর ঘাস আর খড় দেখা যাচ্ছে। তারপর জমিটা একটু উঁচু হয়ে বসতিতে পরিণত। চিমনিসহ ছোট-ছোট দু'-তিনটে কটেজ দেখা যাচ্ছে। বাড়িগুলোর পিছনে কবেকার বন্ধু হয়ে অন্ধকারের মধ্যে দাঁড়িয়ে আছে নানা রকমের গাছ। তার মধ্যে দীর্ঘ দুই সাইপ্রেসকে এই এতদূর থেকেই চিনতে পারল ঋত্বিক। গাছ যেখানে শেষ, সেখানে... না, পাহাড় নয়, টিলার আভাস। কালচে সবুজ টিলা একসময়ে মিশে গিয়েছে ঘন নীল আকাশে। স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছে ঋত্বিক। আর আকাশ, সে কিন্তু এই রাতের মতো অবিচল নয়। তার বয়ে চলা দেখতে পাওয়া যাচ্ছে পরিষ্কার। সে বাঁদিক থেকে ডানদিকে বয়ে চলেছে ধীরে। তার কোনও তাড়া নেই, কোথাও যাওয়ারও নেই যেন, তবু, যেতে হয় বলেই সে বয়ে যাচ্ছে এই নৈশ উপত্যকার উপর দিয়ে। যেভাবে চাদর বয়ে যায়, সেভাবেই। আর সব চাইতে বিস্ময় যারা, তারা ফুটে রয়েছে ওই বহমান আকাশেরই গায়ে। নক্ষত্রেরা। উজ্জ্বল হলুদ আলোর বিচ্ছুরণ নিয়ে তারা আকাশের গায়ে চক্রবৎ ঘূর্ণায়মান। তাদের চারপাশে আলোর সতেজ বলয় পাক খাচ্ছে কোন এক মহাজাগতিক উন্মাদনায়, কোন এক অতীব অস্থিরতায়, এই পৃথিবী থেকে যার হদিশ পাওয়া অসম্ভব। কিন্তু এত অস্থিরতার মধ্যেও যা এই উপত্যকাকে ছেড়ে যায়নি, তা হল শান্তি। পার্থিব শান্তি। মহাজগতের অভ্যন্তরে কেবল জগৎমাত্র।

ঋত্বিক কতক্ষণ স্তব্ধ হয়ে দাঁড়িয়েছিল তা সে খেয়ালই করেনি, হঠাৎ সামনে এক পা বাড়াতেই সে বুঝল ভুল হয়ে গিয়েছে, কারণ কাচের দেওয়ালটা আর নেই। সে কিছু বোঝার আগেই গড়িয়ে পড়তে লাগল এবড়ো-খেবড়ো টিলার গা দিয়ে, যেখানে নানারকমের ছোট-ছোট গাছ আর লতাগুল্ম ঘুমোচ্ছিল। সে গড়াতে লাগল। আর তার মাথার উপর নির্লিপ্তি নিয়ে গড়িয়ে যেতে লাগল বয়সহীন বৃদ্ধ আকাশ।

এইভাবে কতক্ষণ সে গড়িয়েছে খেয়াল নেই, কিন্তু শেষমেশ এসে থামল যেখানে, সেখান থেকে একটু দূরেই দেখা যাচ্ছে সেনা ছাউনি। টানা লম্বা একতলা বারান্দা আর ঘর, ছাদের বদলে টালির চাল। চারদিকে সশস্ত্র পাহারাদাররা ঘুরছে, হাতে রাইফেল। তাদের বুটের মশমশ আর চারপাশের উপত্যকা থেকে ঝিঁঝির ডাক, এ ছাড়া অন্য কোনও আওয়াজ নেই কোথাও। আর্মি ভ্যান দাঁড়িয়ে আছে দুটো, পাশে দু'খানা জিপও দেখতে পেল সে।

এ কোথায় চলে এল ঋত্বিক? এসব তো তার অফিসের জানলা থেকে দেখা যায়নি! এই সেনা ছাউনি, এই গভীর রাতের পাহারা বা এই আন্তরিক সতর্কতা? ঋত্বিক বুকে ভর দিয়ে ঝোপের মধ্যে শুয়ে থেকেই দেখতে পেল, বাঁদিকের একটা ঘরের জানলার ধারে একটা রাইটিং ডেস্ক আর চেয়ার। আর সেই চেয়ারে বসে আছে তার ভাই। নিজের ভাই। তার চেয়ে চার বছরের ছোট। সৌপ্তিক। সে-নামে অবশ্য কোনও দিন ডাকেনি তাকে ঋত্বিক। ডাকনাম বাপ্পা। সে-নামেও ডাকেনি। সে ভাইকে ডাকত ভাই বলেই। আর ভাইও তাকে দাদা বলেই ডাকত। খুব সহজ ব্যাপার। ওর পোস্টিং ছিল অরুণাচলে, যখন ও ক্যাপ্টেন হয়েছে সবেমাত্র। এই জঙ্গল কি অরুণাচলের জঙ্গল তা হলে? কিন্তু অরুণাচলে কি সাইপ্রেস হয়? মনে পড়ছে না ঋত্বিকের। সে দেখতে পেল, ভাই বেশ কিছুক্ষণ জানলার বাইরে, দূরের পাহাড়ের দিকে তাকিয়ে। তার মুখ থমথমে, হাতে একটা ডটপেন। তারপর মুখ নামিয়ে, সাদা প্যাডের পাতায় একখানা চিঠি লিখতে শুরু করল সে।

দাদা,

হয়তো এটাই তোকে লেখা আমার শেষ চিঠি। কারণ হয়তো আর তোকে লেখার কিছু নেই আমার, তা ছাড়া আমি এ-ও জানি না যে আমার চিঠিগুলোর আদৌ কোনও দরকার আছে কিনা তোর। তুই বোধহয় জানিস, আমরা যে-কাজটা করি, সেটা বেশ কঠিন। যুদ্ধ অনেক দূরের ব্যাপার, কিন্তু প্রথম কয়েক বছর যেরকম ট্রেনিং-এর মধ্যে দিয়ে যেতে হয়, তা অন্য কোনও পেশায় নেই। তারপরেও রোজকার যে-রুটিন আমাদের, সেটাও অনেকে কল্পনা করে উঠতে পারবে না। এ জন্য তো কাউকে দোষ দিচ্ছি না। আমি বরাবর চেয়েছিলাম আর্মি জয়েন করতে, তুই অন্তত জানিস। বাবা-মা আমার সিদ্ধান্তকে বাড়ির প্রতি অভিমান বলে ভেবেছিল হয়তো গোড়ার দিকে, কিন্তু তুই ভাবিসনি। সেই কারণে হাওড়ায় যেদিন ট্রেনে তুলে দিতে এলি, সেদিন তোর মুখে হাসি ছাড়া কিছু দেখিনি। ওই মুখটাই এখনও আমার চোখে লেগে আছে। কেন জানিস? কেননা তার পর আর তোকে দেখিইনি আমি।

যদি ভাবিস অভিযোগ করছি, তা হলে বলি, হ্যাঁ, করছি। এই এত দূরে এত অসুবিধের মধ্যে থেকেও আমার কাছে একটাই ভাল লাগা, জানিস কি তুই? কবে ছুটি পাব, কবে বাবা-মাকে আর তোকে দেখতে পাব। কিন্তু এবারের ছুটি থেকে ফিরে আমি বুঝলাম, আমার জন্য আর কোনও সময় নেই তোর। এমনকী তা নিয়ে আর কোনও খারাপ লাগাও নেই। এর আগের বারের ছুটিতে যখন বাড়িতে গিয়েছিলাম, তুই লন্ডনে গিয়েছিলি ওয়র্কশপ অ্যাটেন্ড করতে। অ্যান্ড আই ওয়জ় প্রাউড অফ ইউ দাদা। আমি বরাবরই তোকে

আইডল হিসেবে দেখেছি। মাত্র চার বছরের বড় হলেও, তোকেই গার্ডিয়ান ভেবেছি সব সময়। তাই তোর সঙ্গে সেবার দেখা না হলেও খুব খুশি হয়ে ফিরেছিলাম, যে তুই দশজনের একজন হতে গিয়েছিস। কিন্তু এবার কী হল?

তোকে সেই কবে থেকে বলে রেখেছিলাম, সেপ্টেম্বরে আসছি, তিনদিন মাত্র থাকব। তুই জানিস, আমার কত কী বলার থাকে তোকে। ছিলও। নানা কারণে ঝিমলির সঙ্গে সম্পর্কটা খুব অদ্ভুত হয়ে আছে, আর আই রিয়েলি নিডেড ইয়োর হেলপ। সেসব ছাড়। কতদিন আমাদের দেখা হয় না বল তো? কিন্তু তুই আমার আসার খবর জেনেও বন্ধুদের সঙ্গে পুরী বেড়াতে চলে গেলি? সেটাও আমাকে না জানিয়ে? আমি বাড়িতে এসে তোকে খুঁজছি যখন, মা আমাকে জানাল তুই নেই, ফিরবি পাঁচ দিন পর, যখন আমি আবার ক্যাম্পে ফিরে এসেছি। হিসেব মতো তুই গতকাল হয়তো ফিরেছিস পুরী থেকে।

বিলিভ মি দাদা, আমি, ইন্ডিয়ান আর্মির এই পঁচিশ বছর বয়সি একজন ক্যাপ্টেন, আমাদের বিছানায় শুয়ে সারারাত কেঁদেছি। আর সেটা স্বীকার করতে আমার লজ্জা নেই। আই ওয়জ় সো শকড! আমি সারাটা রাত নিজেকে বিশ্বাস করাতে পারছিলাম না যে তুই এটা করতে পারলি! আর দু'দিন পরেই তো যেতে পারতিস দাদা, পারতিস না? আমার সঙ্গে দেখা করার কি কোনও ইচ্ছে বা দামই নেই তোর কাছে?

প্রশ্ন করছি কেন! আমি জেনে গিয়েছি, নেই। তুই এমনকী ওই তিন দিনে বাড়িতে একবার ফোন পর্যন্ত করিসনি আমার সঙ্গে কথা বলার জন্যে। তোকে ফোনে ধরার কোনও উপায় ছিল না আমার, তুই জেনেবুঝেই রাখিসনি। তার মানে তো এই যে তোর কাছে আমার আর কোনও অস্তিত্ব নেই। ভাল। এটা মেনে নেওয়া আমার পক্ষে এখনও কঠিন ঠিকই, কিন্তু এটা জেনে নেওয়াটা দরকার ছিল খুব।

তুই খুব ভাল থাকিস। জীবনে যা হতে চাস, হোস। কিন্তু আমার বলতে খুব খারাপ লাগছে যে আর পাঁচজন সিভিলিয়ানের সঙ্গে তোর আর কোনও তফাত রইল না, আমার কাছে।

গুডবাই।

ভাই

চিঠিটা, এই এতদূর থেকেও পড়ে ফেলতে পারল ঋত্বিক, কারণ চিঠিটার প্রত্যেক অক্ষর তার মুখস্থ। তারপর, পড়া শেষ হলে, ঘুমিয়ে পড়ল চুপচাপ। ওই চিঠিটা তার কপালে জ্বর এনে দিয়েছে।

৮

প্যারিস, ফ্রান্স
জানুয়ারি, ১৮৮৯

আজ দিনটা মন্দ ছিল না থিও ভ্যান গঘের। সকাল-সকালই বাড়ি থেকে বেরিয়ে পড়েছিলেন তিনি, যদিও আজ মোটেই বেরোনোর মতো আবহাওয়া ছিল না। গোটা প্যারিস শহর ঢেকে গিয়েছে বরফে। রাস্তা তো পুরু সাদা বরফের লেপে ঢাকা-ই, গাছের শাখায়-শাখায় ভেজা তুলোর মতোই জমে রয়েছে বরফরা। কেবল এই অবধি হলে তবু না-হয় ঠিক থাকত, কিন্তু দিন সাতেক হল, মানে সেই ডিসেম্বরের শেষ থেকে বড়ই ঠান্ডা হাওয়া বইতে শুরু করেছে। খুব কাজ না থাকলে আজ বাড়িতে ফায়ার প্লেসের সামনে বসেই কাটিয়ে দিতেন থিও, কিন্তু এই বৈঠক ছিল ভারী জরুরি।

প্যারিসে এখন আর্ট ডিলার হিসেবে থিওর খ্যাতি নেহাত কম নয়। শিল্পী মহল থেকে হোমরা-চোমরা ক্রেতাদের দল এখন এক ডাকে থিওকে চেনেন। এই পেশায় ঠিকঠাক এগোতে পারলে দু'পয়সা রোজগার করে নেওয়ার সুযোগ কম নয়, আর থিও সেটাই করছেন। এখন প্যারিসে বেশ বড়সড় একখানা অ্যাপার্টমেন্টে জাঁকিয়ে বসেছেন তিনি। দামি আসবাবে সুসজ্জিত সেই ঘরদোরের যত্ন-আত্তি করতে থিওর গুণী বউ জো-র কোনও জুড়ি নেই।

আজ সেইরকমই ছবি বিক্রির একটি লেনদেন নিয়ে এক ব্যবসায়ীর সঙ্গে আলোচনা ছিল শহরের এক দামি হোটেলে। লাঞ্চের আমন্ত্রণে তাই এই শীতেও 'না' করেননি থিও। চুক্তিতে বেশ মোটা অঙ্কই তাঁর পকেটে আসবে। এটা ভেবে খুশি হয়ে যখন হোটেলের লবি থেকে রাস্তায় নামলেন থিও, তখন তুষারপাত শুরু হয়ে গিয়েছে। এই জিনিসটা তিনি একেবারে বরদাস্ত করতে পারেন না। এর চাইতে জুলাই মাসের ঝমঝমে বৃষ্টিও ঢের ভাল, মনে-মনে বললেন থিও। তবে কিনা, মিটিংটা তাঁর মন বেশ ভাল করে দিয়েছে। তিনি বরাবরই চেয়েছিলেন প্যারিসের সম্ভ্রান্ত মহলের অংশ হয়ে উঠতে, আর তা যে তিনি পারছেন, এটা ভেবেই ইদানীং ভাল লাগে তাঁর।

আর কেবল নিজের বা নিজের পরিবারের জন্য তো নয়, তাঁর সবচাইতে বড় দায়িত্ব তাঁর পিঠোপিঠি দাদা, ভিনসেন্ট। ওই একলা ছন্নছাড়া মানুষটিকে তাঁর লাগামহীন উন্মাদনা কবেই খেয়ে হজম করে ফেলত, যদি না মানসিক আর আর্থিকভাবে থিও তাঁর পাশে ছায়ার মতো লেগে থাকতেন। এ কথা প্যারিসের চেনাজানা পরিসরে অনেকেই এক বাক্যে স্বীকার করেন। দাদার প্রতি ভাইয়ের এই মমত্ব আজকের যুগে আর কোথায়? এই প্রশ্ন করে থিওর পিঠ চাপড়ে দেন তাঁরা। কিন্তু তাঁরা এ কথা মোটেই বোঝেন না যে এ হল একজন জাত প্রতিভাবান শিল্পীর প্রতি একজন মুগ্ধ অনুরাগীর সহযোগিতা। নিজের দাদাকে নয়, পোস্ট-ইম্প্রেশনিস্ট মুভমেন্টের শ্রেষ্ঠ শিল্পীকে যখন যেভাবে পারেন সাহায্য করাটা তাঁর কর্তব্য বলেই মনে করেন থিও।

দূরে, এই ঝাপসা হয়ে আসা দুপুরে গির্জার চুড়ো আরও ঝাপসা হয়ে আসছে বরফের ঝিরঝিরানিতে। এমনিতে হেঁটেই বাড়ি ফেরা পছন্দ করেন থিও। রাস্তাঘাট দেখতে-দেখতে আপনমনে হাঁটা তাঁর খারাপ লাগে না মোটেই, কিন্তু আজ একটা ঘোড়ার গাড়ি না ডাকলেই নয়। সামনের মোড়েই খদ্দেরের আশায় একখানা এক্কা দাঁড়িয়ে, ঝটপট সেটায় উঠে পড়েই বাড়ির ঠিকানা বলে দিলেন থিও।

জো তখন জানলার ধারে বসে উল বুনছিলেন, যখন থিও বসার ঘরে ঢুকে স্ট্যান্ডে ঝুলিয়ে রাখলেন তাঁর অল্প ভেজা বাদামি ওভারকোট। দাদার সঙ্গে ভাইয়ের চেহারার যে এত মিল থাকতে পারে, থিও আর ভিনসেন্টকে না দেখলে বিশ্বাসই হত না জো-র। অথচ তাঁরা যমজ নন মোটেই।

"এক কাপ কফি খেতে চাও তুমি?"

উত্তরটা জেনেও প্রশ্নটা করলেন জো, তারপর নিজেই উঠে গিয়ে জানলার ধারের টেবিলটায় জড়ো করলেন কেটল আর দুটো কাপ। গরম, কালো কফির চেয়ে এই শীতের দুপুরে ভাল আর কিছুই হতে পারে না।

"কেমন হল তোমাদের মিটিং?"

"খুবই ভাল। সত্যি বলতে কী, এর পর আমরা একটা ছুটির কথা ভাবতে পারি।"

"বাহ, তা হলে তো খুব ভাল হয়। কতদিন প্যারিসের বাইরে যাই না।"

"বলো, কোথায় যেতে চাও? আমি ব্যবস্থা করব।"

এমন একখানা কথা থিওর মুখ থেকে শুনে খুশিই হওয়া উচিত জো-র, কিন্তু তিনি খুশি হতে পারছেন না। স্কুলগুলো ছুটি হয়েছে, বাইরে ছেলেমেয়েরা খিলখিল করতে-করতে এই ঠান্ডার মধ্যে ছুটোছুটি শুরু করেছে। আজও ওরা রোজকার মতোই বরফ নিয়ে খেলবে নিশ্চয়ই।

"নাহ্ থিও, থাক বরং। এখন আমরা কোথাও যাব না।"

"সে কী, কেন? এই তো বললে..."

"গেলে ভাল লাগবে ঠিকই, কিন্তু ভিনসেন্টের অবস্থা তো দেখছ। ও যে কখন কী করে বসে তার ঠিক নেই। আমরা কাছাকাছি আছি বলে ভরসা। দূরে গেলে যদি কিছু হয়, তখন ভারী আক্ষেপ হবে। তাই না?"

উত্তরে কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে চেয়ার ছেড়ে উঠে জো-র শীতল কপালে একখানা চুমু দিয়ে ফের বসলেন থিও। শুধু পয়সাকড়ি নয়, জো-কে পাশে পেয়েছিলেন বলেই থিও এভাবে এতদিন ধরে নিজের দাদার খরচাপাতি আর পাগলামো সামলে যেতে পারলেন। জো কোনওদিন বাধা তো দেনইনি, বরং উলটে সব সময় ভিনসেন্টের হয়ে তদবির করেছেন তাঁর কাছে। কখনও-সখনও দাদার পাগলামিতে যদি- বা থিও বিরক্ত হয়েছেন, জো কখনও হননি। ভিনসেন্ট যেন তাঁর কাছে সন্তানেরই মতো। ভাশুরকে স্নেহের চোখেই দেখেন জো। আর শ্রদ্ধা করেন তাঁর অদম্য শিল্পীসত্তাকে। সত্যি বলতে কী, এই দু'জনের অগাধ ভরসা আর পলের অকৃত্রিম বন্ধুত্ব ছাড়া ভিনসেন্ট এভাবে এঁকে যেতে পারতেন না।

"এ তুমি ঠিকই বলেছ। বেশ, তা হলে এখন যাব না কোথাও। যা-ই হোক, কেউ এসেছিল এর মধ্যে?"

"ও হ্যাঁ, পোস্টম্যান। ভিনসেন্টের চিঠি এসেছে।"

প্রিয় ভাই আমার,

আমি নিশ্চিত যে আঁকাজোকার ব্যাপারে গগ্যাঁই তোমাকে সব জানাবে। আশা করছি খুব শিগগির আবার কাজে ফিরতে পারব আমি।

আমি বাড়িতে না থাকলেও, আমার ভাল বন্ধু রোল্যাঁ সব গুছিয়ে-গাছিয়ে রেখেছে, আমি জানি। ফিরে এসে আগের মতোই দিন কাটাব, দেখো। আর ভাল দিন খুব দ্রুত এসে পড়বে, যখন আমি বসন্তের অর্চার্ড আঁকতে শুরু করব।

কিন্তু প্রিয় ভাই আমার, তোমার প্যারিস থেকে আর্ল আসার ধকলটা মোটেই মন থেকে মেনে নিতে পারছি না। বিশ্বাস করো, আমার তেমন কোনও ক্ষতি বা জখম হয়নি যে তুমি এতদূর সব কাজ ফেলে ছুটে এসেছিলে। ভারী খারাপ লাগছে এখন ভেবে।

তবে হ্যাঁ, এ কথা ভেবে খুব ভালও লাগে যে তুমি জীবনে শান্তি পেয়েছ, সংসার পেতেছ।

আমার খুব ইচ্ছে ছিল চমৎকার আবহাওয়ার দিনগুলোয় তোমাকে আর্ল-এ পেতে। কিন্তু দ্যাখো, এলে যখন, তখন চারিপাশ কেমন শুকনো আর অন্ধকার।

যা-ই হোক, ভাল থেকো আর হ্যাঁ, চিঠির উত্তর আমার পুরনো ঠিকানা, ২ নম্বর প্লেস লা মার্টিনেই পাঠিয়ো। হলুদ বাড়িতে গগ্যাঁর কিছু কাজ এখনও পড়ে আছে, সে চাইলেই সেগুলো ফেরত পাঠানোর বন্দোবস্ত করব। ও-বাড়ির ফার্নিচার কিনে দেওয়ার টাকাটা গগ্যাঁর কাছে ধার আছে এখনও।

আমার উষ্ণ করমর্দন জেনো। আবার আমাকে ফিরতে হবে হাসপাতালেই, কিন্তু আপাতত আমি ছুটি চাই।

চিরকালের জন্য তোমার
ভিনসেন্ট

চিঠিটা হাতে নিয়ে জানলা ঘেঁষে দাঁড়ালেন থিও। বরফের ঝিরঝিরানি কমেছে কিছুটা। বাইরের রাস্তা পেরিয়ে ওপাশের ছোট্ট গলিতে, ক্যাফেটার পাশে বরফ নিয়ে খেলছে স্কুলফেরত বাচ্চা দুটো ছেলে। মুখের মিল আছে তাদের। ওরা কি দুই ভাই? তাঁর আর ভিনসেন্টের মতোই? এই স্বাভাবিক জীবনটা কোনও দিনই ভিনসেন্টের সঙ্গে কাটানো হল না তাঁর।

কান কেটে ফেলার খবরটা যখন পৌঁছেছিল তাঁর কাছে, প্রথমটায় অবিশ্বাস্য ঠেকলেও, পরদিন সকালের প্রথম ট্রেন নিয়েই তিনি ছুটেছিলেন আর্ল-এ। রাগ, প্রচণ্ড রাগ হচ্ছিল তাঁর ভিনসেন্টের উপর। মানুষটা কি কোনও দিন একটু শান্তি দেবে না? সারাক্ষণ দুশ্চিন্তায় রাখবে আর ছুটিয়ে মারবে? পরিচিত মহলে মাথা হেঁট করে দেবে সারা জীবন? ভেবেছিলেন হাসপাতালে ঢুকে সমবেদনার বদলে একচোট রাগ দেখিয়ে আসবেন। কিন্তু হল উলটোটা। কানে-মাথায় ব্যান্ডেজ করে শুয়ে থাকা ভিনসেন্টকে দেখে থিওর চোখে জল চলে এল। যদিও তাঁর দু'হাত বুকের উপর চেপে ধরে চিরকালের সেই পাগলাটে হাসিটাই তখন হাসছিলেন ভিনসেন্ট।

মানুষটা কোনও দিন শান্তি পাবে না। তবু যদ্দিন আছে, তার অশান্তির আগুনে জল ঢেলে যাওয়াটাই তাঁর কাজ, ভাবলেন থিও। ভাবলেন, আর নিজেকে ব্যর্থ মনে হল তাঁর। এত-এত ছবি বিক্রি করছেন রাতদিন, ভিনসেন্টের একটাও ক্যানভাস বিক্রি করে উঠতে পারলেন না। এমন নয় যে চেষ্টা করেননি। কিন্তু কেউ সেসব পেইন্টিং পছন্দ করছেন না। বলছেন, এ কোনও ছবিই নয়। অথচ থিও জানেন, প্রত্যেকটা ক্যানভাসে কী পরিমাণ আগুন ওত পেতে রয়েছে। সকলে ক্লদ মোনে-র ক্যানভাস কিনতে চাইছে এখন। হইহই করে বিকোচ্ছে তাঁর একের পর এক ছবি। কিন্তু সেই দামের দশ ভাগের এক ভাগও জুটছে

না ভিনসেন্টের কপালে। এ থিওরই ব্যর্থতা বই কী। মনে পড়ে যায় তাঁর, বেশ কয়েক বছর আগের এক চিঠিতে ভিনসেন্ট তাঁকে লিখেছিলেন, 'আমি এখন একটাই স্বপ্ন দেখি। কোনও একটা ছোট্ট ক্যাফেতে আমার আঁকার একক প্রদর্শনী হবে একদিন। এটুকুই আমি দেখে যেতে চাই।' হায়! এটুকুও থিও করে উঠতে পারেননি।

কিন্তু আজ এই বরফাচ্ছন্ন বিকেলবেলায় জানলার বাইরে তিনি দেখতে পাচ্ছেন ভবিষ্যৎ। তিনি দেখতে পাচ্ছেন তাঁর বাড়ি থেকে কিছু দূরের পথ পেরোলে যেখানে মিউসে ড'র্সে, যেখানে এখনই শোভা পেতে শুরু করেছে পিসারো আর মোনে-র সাম্প্রতিক কাজ, তারই দেওয়ালের সামনে ভিড় করে মানুষজন দাঁড়িয়ে আছেন, ভিনসেন্টের কোনও না কোনও ক্যানভাসের সামনে। এটা দেখতে পাচ্ছেন থিও। তারপর একবার চোখ কচলে কলম তুলে নিচ্ছেন। ভিনসেন্টকে একটা উত্তর লিখে পাঠাতে হবে আজই।

৯

গুড হোপ নার্সিং হোম, কলকাতা
নভেম্বর, ২০১৭

খুব স্নিগ্ধ একটা সাদা আলোর মধ্যে একদিকে শর্মিলা দাঁড়িয়ে, আর একদিকে ঋত্বিকের অফিসের দুই কলিগ শান্তনু আর পার্থ। একটু দূরে একটা সোফায় বসে শর্মিলার বাবা অলকেন্দুবাবু আর ঋত্বিকের মা অর্পিতা। সাদা আওয়াজহীন একটা দরজা মোলায়েম ঠেলে যিনি ঢুকে এলেন এই ঘরে, তিনি নিশ্চয়ই ডাক্তার। ঋত্বিক একটু হাসার চেষ্টা করল শর্মিলার দিকে তাকিয়ে, কারণ তার মুখ একেবারেই শুকনো হয়ে আছে।

অবশ্য হওয়ারই তো কথা। তিনটে নাগাদ পার্থ আর শান্তনু বোর্ডরুমে ঢুকে দেখেন ঋত্বিক কাচের দেওয়ালের সামনেটায় অচৈতন্য অবস্থায় পড়ে। হাত ধরে তুলতে গিয়ে তাঁরা বোঝেন, গা জ্বরে পুড়ে যাচ্ছে। এ সময়ে কাছের কোনও নার্সিং হোমে নিয়ে যাওয়াটাই তাঁরা উচিত বলে মনে করেছেন। প্রেশার ফল করে গিয়েছে খুবই, স্যালাইন দিতে হচ্ছে যে-কারণে। ডক্টর বক্সী, যিনি দেখছেন ঋত্বিককে, আপাতত কোনও রকম মেন্টাল স্ট্রেস নিতে বারণ করে দিয়েছেন। এমনকী অফিস করাও চলবে না তার। এসব ঋত্বিক এখনও জানে না, সে কেবল চোখ মেলে এই চেহারাগুলোই দেখতে পাচ্ছে, যাদের সঙ্গে এইবার জুড়ে গেল ডক্টর রুখসার আহমেদের মুখও। তিনি অবশ্য বেডের পাশে দাঁড়িয়ে ভরসার হাসিই হাসলেন একবার।

এখন কি বিকেল তা হলে? না পরের দিন সকাল? কিছু মনে করতে পারছে না ঋত্বিক। সে ওই অন্ধকার ঝোপের মধ্যে টলে পড়ে যাওয়াটুকুই মনে আনতে পারছে কেবল। আর পারছে ভাইয়ের চিঠির শব্দগুলো একটা-একটা করে মনে করতে।

"আমার এবার সত্যি একটু ভয় করছে। তুমি কি বুঝতে পারছ সেটা?"

বাকিরা রুমের বাইরে বেরিয়ে যাওয়ার পর ঋত্বিকের ছুঁচ বেঁধানো হাতের আঙুল ধরে কথাটা বলল শর্মিলা। রুখসার নার্সিং হোমের নীচে অপেক্ষা করবেন বলে গিয়েছেন, তাঁর কথা বলা দরকার। বাকিরা আজকের মতো বাড়ি।

"জানি। দিস ইজ নট নর্ম্যাল।"

"সেটা পরের প্রশ্ন। কিন্তু তোমার মন আর শরীর, দুটোর উপরেই মারাত্মক চাপ পড়ছে। ডাক্তার লিখে দিয়েছেন, তোমার পুরোপুরি রেস্ট দরকার। সো, কাল থেকে নো অফিস। কেমন?"

"সে নয় বুঝলাম, কিন্তু বাড়িতে বসে থাকলে কি সেরে যাবে এটা?"

"তা বলছি না। তার জন্য তো ওষুধ চলছেই। আরও কিছু টেস্টস-এর কথা ডাক্তার বলেছেন। নীচে রুখসারদি অপেক্ষা করছেন, দেখি উনি কী বলেন। কিন্তু এসবের উপর ওয়র্ক লোড চাপলে সাংঘাতিক ফল হতে পারে। সেটা কোরো না প্লিজ।"

কথাগুলো ঋত্বিকের দিকে তাকিয়ে বলতে বলতেই শর্মিলা বুঝতে পারছে, ঋত্বিকের দৃষ্টির অনেকখানিই এই ঘরে নেই, তার মনের মতোই।

"বেশ, তুমি বললে যাব না অফিস। বাড়িতে বসে কী করব তা হলে?"

"সে আমি দেখছি। আঁকতে পারো তো। ক্যানভাস, রং, তুলি, সব কেনা আছে। পারো না?"

"আজ ইন্ডিয়ার ম্যাচ ছিল না? স্কোর জানো?"

শর্মিলা বেরিয়ে গেল ঘর থেকে। বাইরের সাদা আলোটা এবার হলুদ হয়ে এসেছে। অর্থাৎ বিকেল হচ্ছে। এমনটাই আন্দাজ করে নিল ঋত্বিক।

তাকিয়ে থাকতে মোটেই ইচ্ছে করছে না তার। যতই সাফসুতরো হোক, নার্সিং হোমের ঘর তার এক্কেবারে ভাল লাগে না। আশা করা যায় কাল তাকে ছেড়ে দেওয়া হবে। নিজেকে এভাবেই খুশি করার চেষ্টা নিয়ে সে চোখ বন্ধ করল। তার মধ্যেও যে একটু ভয় ঢুকে যায়নি, এমনটা নয়। সে বুঝতে পারছে তার স্বাভাবিক বেঁচে থাকাটা আস্তে-আস্তে হাতের বাইরে চলে যাচ্ছে। অথচ কেউ তেমন কিছু করে উঠতে পারছে না। আজকাল এই ভেবে সকাল থেকে দুশ্চিন্তা, উদ্বেগ, এমনকী চোরা অপেক্ষা শুরু হয়ে যায় তার মনে যে, কখন কোন এক অজানা দৃশ্য এসে চোখের সামনে দাঁড়াবে। আর হয়ও তাই।

এরা কি এখন একটু ঘুমের ওষুধ দেবে না চাইলে? কারণ দৃশ্য নয়, আপাতত স্মৃতি থেকেই পালাতে চাইছে ঋত্বিক, যা এখন তার পিছনে ছুটে আসছে।

ভাইকে চোখের আড়াল হতে দিত না সে। চার বছরের ছোট ভাইও, বাবা-মা নয়, দাদাকেই অভিভাবক মানত। দাদার বন্ধুরা তারও বন্ধু হয়ে গিয়েছিল। নাটক-সিনেমা দেখতে গেলে ঋত্বিকের স্কুল বা কলেজের বন্ধুরা একরকম অভিযোগই করত ভাই সঙ্গে না এলে। এইরকম প্রাণের বন্ধু ভাই যখন তিনদিনের ছুটিতে আগাম জানিয়েই বাড়ি এল, সব জেনে-বুঝে কেন পুরী বেড়াতে চলে গেল ঋত্বিক?

এই প্রশ্নের উত্তরটাই হল সেই স্মৃতি, যার কাছে এখন ঋত্বিক কিছুতেই যেতে চাইছে না। কিন্তু স্মৃতির গতি কখনও আলোর চেয়েও বেশি। আর সে তো স্থাণু একটা বিছানায় শুয়ে আছে মাত্র। তাই চোখ বন্ধ করেই সে দেখতে পেল, কলেজের সেকেন্ড ইয়ারের কোনও একটা পরীক্ষা শেষ হওয়ার পর তারা ক'জন বন্ধু মিলে বেড়াতে গিয়েছে গড়পঞ্চকোট। তখনও সেখানে থাকার জায়গা বলতে একটিমাত্র। কী একটা লজ যেন। তাদেরও তখন পকেটে টাকাকড়ি নেই প্রায়। খুব সস্তার সেই লজটি ছিল তাদেরই বন্ধু শৈবালের কেমন যেন এক কাকার। তাঁকে বলে-কয়ে তিন চারটে রুম বুক করে হইহই করে গড়পঞ্চকোট এসে পড়েছিল তারা। ঋত্বিক, শৈবাল, বহ্নি, সোমনাথ, সুদক্ষিণা, তরুণ আর ভাই। মানে সৌপ্তিক। সে তখনই দারুণ মাউথ অর্গ্যান বাজায়, তাই তাকে এ ট্রিপে না আনলে চলবে না। সে বছরই বোধহয় স্কুল শেষ করে বেরিয়েছিল ভাই।

লজটি বেশ ছিমছাম। জুলাই মাসের মাঝামাঝি, এক-দু'পশলা বৃষ্টি লেগে থাকায় গরমটা তেমন টের পাওয়া যাচ্ছে না। লজের সামনেই একটা সরু কাঁচা রাস্তা, যা ধরে ডানদিকে নেমে গেলে ছোট্ট একটা স্থানীয় বাজার আর কয়েক ঘর বসতি। আর বাঁদিক ধরে উঠে গেলে পাহাড়ের সামনে পৌঁছে যাওয়া যায় সোজা।

প্রথম সন্ধেতেই, মনে পড়ে যাচ্ছে ঋত্বিকের, জমিয়ে আড্ডা বসেছিল বারান্দায়। কাছের ওই বাজার থেকেই তারা বিকেল-বিকেল ফেরার পথে কিনে এনেছিল দু' বোতল রাম, ছোলা বাদাম মাখা আর গরম-গরম পেঁয়াজি। অন্ধকার নামতেই সামনের গোল বারান্দায় চেয়ার জড়ো করে বসে পড়া হয়েছে সেদিন। দূরে তখনও পাহাড়ের মাথা আর আকাশ আলাদা করা যাচ্ছে, একটু পরে কেবল পাহাড়ের গায়ে-গায়ে জ্বলে থাকা ছোট হলুদ টিমটিমে আলো ছাড়া কিছু থাকবে না।

সুদক্ষিণা সেদিন পরে ছিল একটা নীল টি-শার্ট আর জিন্‌স। স্পষ্টই মনে আছে ঋত্বিকের, কারণ সুদক্ষিণার প্রেমে পড়েছিল সে। ইংলিশ অনার্স সুদক্ষিণাকে সে কথাটা জানিয়েওছে বহুবার। কিন্তু 'তুই আর আমি খুব ভাল বন্ধু রে' বলে বিষয়টা এড়িয়ে গিয়েছে সুদক্ষিণা। কত-কত চিঠি লিখেছে ঋত্বিক সুদক্ষিণাকে। উত্তর পায়নি। চায়ওনি অবশ্য। এদিকে কলেজ থেকে বাড়ি, আড্ডা থেকে পিকনিকে সুদক্ষিণা সত্যিই ঋত্বিকের ভাল বন্ধু হয়ে উঠেছে। কিন্তু তার বাইরে আর কোনও সম্পর্ক সে যে চায় না, সেটাও ঋত্বিককে বুঝিয়ে দিতে পেরেছে সফলভাবে।

কথাটা ভাই ছাড়া আর কাউকে বলেনি ঋত্বিক। ভাইকে না বললে সে দমবন্ধ হয়ে মরে যেতে পারত। ভাই অবশ্য তাকে বলেওছিল, এতবার 'না' শোনার পর আর কিছু আশা না করতে, কিন্তু ঋত্বিক ভেবেছে এই গড়পঞ্চকোটে একবার শেষ চেষ্টা করে দেখবে। এই

ঝমঝম বৃষ্টি, এই নেশা ধরা সন্ধেবেলা, এই পাহাড়ের গায়ে-গায়ে আলো, এই ঠান্ডা হাওয়া... এসবের গুণে মানুষের মন তো পালটাতেই পারে। পারে না?

সুদক্ষিণা গিয়েছে গা ধুতে, ভাই নীচে চৌকিদারকে রাতের রান্না বুঝিয়ে দু' প্যাকেট সিগারেট কিনে ফিরছে। এমন সময়ে শুরু হয়ে গেল আড্ডা। গ্লাস জোগাড় হয়েছে ক'টা, তাতেই পানীয় ঢেলে জোর হই-হুল্লোড় শুরু হয়েছে। শৈবাল আর বহ্নি ডুয়েট গাইছে, আগুনের পরশমণি। শেষ হওয়ার পর আর একটা করে পেগ ঢেলে নিয়েই খোঁজ পড়ল ভাইয়ের। এবার মাউথ অর্গ্যানে 'হ্যায় অপনা দিল'-টা না হলেই নয়। এই গানটা ভাই সত্যিই নিখুঁত বাজায়।

উঁহু, নীচে চৌকিদারের ঘরে নেই। সে নাকি অনেকক্ষণ বাজারের দিকে চলে গিয়েছে। কিন্তু এই অন্ধকারে বাজারে গিয়ে দেখে আসতে গেলে আড্ডাটাই মাটি। খোঁজ শেষ করে উপরে উঠে যেতে যাবে ঋত্বিক, এমন সময়ে ছাদের পাঁচিলের দিকে নজর গেল তার। দোতলা পার করে ছাদের দরজা পর্যন্ত উঠে আসতে তার সময় লাগল সেকেন্ড কুড়ি। আর উঠে এসে দরজার কাছেই দাঁড়িয়ে থাকল সে।

সামনে, লজের মেন গেটের দিককার পাঁচিলে হেলান দিয়ে এদিকে মুখ করে চোখ বন্ধ অবস্থায় দাঁড়িয়ে আছে সুদক্ষিণা। তার টি শার্ট খুলে পাঁচিলে রাখা। চাঁদ উঠেছে অদ্ভুত একটা। সেই আলোয় এই দৃশ্য দেখে থমকে গেল ঋত্বিক। গাঢ় কোনও এক রঙের ব্রা আর জিন্‌স পরে দাঁড়িয়ে সুদক্ষিণা। আর ঋত্বিকের দিকে পিঠ করে দাঁড়িয়ে সুদক্ষিণার গলায়, বুকে, ঘাড়ে, ঠোঁটে মুখ ঘষছে সাদা কালো ডোরাকাটা গেঞ্জি পরা একটা ছেলে। ভাই।

বহু বছর ওই দরজায় দাঁড়িয়ে দৃশ্যটা দেখল ঋত্বিক, কারণ ওই চাঁদের আলো তার বয়স বাড়িয়ে দিল। তারপর ছুটে নেমে এল আবার। কী করবে সে বুঝতে পারছে না ঠিকই কিন্তু তার ছোটা দরকার খুব। ছুটে আসা দরকার কিছুটা। নইলে সে যা খুশি করে ফেলতে পারে এখন আর সেটা সে চায় না। বেরোনোর সময় দেখতে পেল, চৌকিদারের ঘরের বাইরের পাঁচিলে চাঁদের আলোয় চকচক করছে ভাইয়ের মাউথঅর্গ্যান। কী মনে হতে সেটা মুঠোয় পুরে নিয়ে দরজা দিয়ে বেরিয়ে ডানদিকের ঢাল বেয়ে ছুটতে-ছুটতে যখন নেমে যাচ্ছে ঋত্বিক, তখন লজের অন্ধকার বারান্দায় শৈবাল-বহ্নির ডুয়েট। আজ জ্যোৎস্নারাতে সবাই গেছে বনে।

ঋত্বিক ছুটে যেতে চেয়েছিল পাহাড়ের দিকটাতেই কিন্তু তার দিকজ্ঞান সম্পূর্ণ লোপ পাওয়ায় সে পুরো বিপরীত দিকেই ছুট লাগাল। বিকেলের দিকে এক চোট বৃষ্টি হওয়াতে জায়গায়-জায়গায় জল জমে রয়েছে, বাকি রাস্তাও যথেষ্ট পিছল। তার মধ্যে দিয়েই টাল সামলাতে সামলাতে কিছু দূর ছুটে এসে সে বুঝতে পারল এটা পাহাড় নয়। বাজার।

ততক্ষণে হাঁপ ধরে গিয়েছে তার। বাজারের এক ধারে একটা সিমেন্টের চাঙড় দেখে বসে পড়ে হাঁপাতে লাগল ঋত্বিক। ছোট-ছোট কাঠির মাথায় লণ্ঠন জ্বালিয়ে অথবা কুপি রেখে শুরু হয়েছে সন্ধের বাজার। সবজি, তরিতরকারি, মাছ, সবই আছে। স্থানীয় খদ্দেররা বেশ ভিড় করেই আনাগোনা শুরু করেছেন। যেখানটায় বসেছে ঋত্বিক, তার ঠিক পাশেই মাটিতে বঁটি পেতে দিশি মুরগি কাটছেন একজন দোকানি। এক্ষুনি ওজন করা হয়েছে মুরগিটার, দু' কিলো তিনশো।

প্রথমে গলাটা বঁটি বরাবর রেখে এক ধাক্কায় মসৃণ ভাবে কেটে ফেলা হল, সেইসঙ্গে কাটা মাথা জমা পড়ল গামলায়। কেটে ফেলা গলা দিয়ে তখন সরু ফিনকির রক্ত। পা দুটো ছটফট করছে এদিক-ওদিক, ডানা দুটো ঝটপটাচ্ছে। এরপর পা দুটো একসঙ্গে ধরে কেটে ফেলা হল। জোড়া পা জমা পড়ল গামলায়। তারপর আস্তে-আস্তে নিস্তেজ হয়ে আসতে থাকা শরীরটা থেকে হাত দিয়ে টেনে ছিঁড়ে ফেলা হতে লাগল কালো আর বাদামি পালক। যখন ভিতরের কাঁচা মাংসের শরীরটা বেরিয়ে পড়েছে, তখনও ঠ্যাং দুটো নড়ছে ভালরকম। ওই ঠ্যাং দুটোই আগে কেটে ফেলা হল। লেগ পিস। এরপর পেট চিরে ফেলে ভিতরকার নাড়িভুঁড়ি একটানে বের করে জমা করা হল গামলায়। তারপর নিঃশব্দে কেটে মোট সতেরো পিস করা হল তাকে। শালপাতায় মুড়ে ফেলে দেওয়া হল অপেক্ষারত খদ্দেরের থলের মধ্যে। অন্ধকারে।

গোটাটা খুব মন দিয়ে দেখল ঋত্বিক। মন শান্ত হয়ে এল তার। মাথা, ঠান্ডা। সে উঠে স্বাভাবিক গতিতে হাঁটা লাগাল উলটোদিকে, যেদিকে পাহাড়। একটাই রাস্তা। মাঝখানে লজ পড়ল। আর পড়ল সুদক্ষিণার খিলখিল হাসি। শুনতে পেল না ঋত্বিক। সে আরও মিনিট পনেরো হেঁটে পৌঁছল পাহাড়ের একেবারে গায়ে, যেখানে ঘরবাড়ি কিছু নেই। কেবল মাটির পর মাটি। একটা পাথর খুঁজে পেতে খুব অসুবিধে হল না। পকেট থেকে মাউথঅর্গ্যানটাকে বের করে মাটিতে শুইয়ে পাথর দিয়ে তার মাথাটা থেঁতলে ফেলতে পারল সে। তারপর আধভেজা মাটি মুঠো করে তুলে এনে ঠেসে ধরল যন্ত্রটার হাঁ করা দেঁতো হাসির মধ্যে। একটা একটা করে ফোকর বুজিয়ে দিল সে, মাটি ভরতি করে। তারপর ওই ভরপুর চাঁদের আলোয়, পাহাড়ের ঢাল শুরু হওয়ার একটু আগে, মাটিতেই গর্ত খুঁড়ে পুঁতে ফেলল মাউথঅর্গ্যানটাকে। মাটি চাপা দিয়ে সমান করে দিল আগের মতোই। গোটা ঘটনাটার কোনও সাক্ষী থাকল না। তারপর, হাঁটা দিল লজের দিকে।

করিডর পার করে দ্রুত পায়ে হেঁটে এসে কেবিনে ঢুকল শর্মিলা। ভিজিটিং আওয়ার শেষ হতে আর তিন মিনিট বাকি। চোখ বন্ধ ঋত্বিকের হাতে আস্তে ঠেলা দিতেই তার চোখ খুলে গেল।

”বেশি ভেবো না। কাল ছাড়া পেয়ে যাবে। কেমন?”

১০

অ্যাপার্টমেন্ট ২৫বি, স্কাইরাইজ়, কলকাতা
নভেম্বর ২০১৭

যা কিছু তোমার হাতের মধ্যে আসবে
তা জেনো তুমি, বহু দূর থেকেই আসছে।
তার পথে পড়েছে সরাইখানা ও ব্যর্থতার লণ্ঠন
তার পথে পড়েছে আশ্চর্য সমস্ত স্কার্ফ ও একটি হারানো গ্রাম
কিন্তু সেসব প্রলোভনের রোদ্দুরে, সেসব ভাললাগার তুষারপাতে
না দাঁড়িয়ে
সে যে এসেছে এতখানি দূরের পথ
তা কেবল তোমারই হাতের মুঠোয় ভরে যাবে বলে।
এখন তুমি তাকে অদেখা কোরো না।
বরং একবার তাকাও দূরে, দেখে নাও সেইসব রাস্তা
যা তাকে পেরোতে হয়েছে কত না রাত্রিদিন
তারপর, তোমার স্বপ্নের রোমশ পিঠে
হাত রাখো একবার।
তার চেয়ে বিশ্বস্ত বন্ধু, তোমার ছিল কি কেউ?

"আগের চেয়ে ভাল লাগছে না একটুও?"

বারান্দায় ঋত্বিকের পাশে বসে জানতে চাইল শর্মিলা। আজ দুপুরেই তাকে বাড়িতে নিয়ে এসেছে সে। সকালে ঋত্বিকের সিনিয়র অভিষেক গুপ্ত নার্সিং হোমে এসেছিলেন, সাফ জানিয়ে গিয়েছেন, ঋত্বিককে যেন অফিসের ত্রিসীমানায় দেখা না যায়। ঋত্বিক শুকনো হেসেছিল এ কথার উত্তরে। শর্মিলা নিজেও ছুটি নিয়েছে অফিস থেকে। সরকারি ব্যাঙ্ক বলে তবু এই ছুটিটুকু পাওয়া গেল, বেসরকারি সংস্থা হলে নেহাত অসুবিধেয় পড়তে হত শর্মিলাকে। এখন এই শেষ নভেম্বরের বিকেলবেলায় হালকা এক কাপ গরম কোকো সে

বানিয়ে দিয়েছে ঋত্বিককে, যা ঋত্বিক বেশ তারিয়ে-তারিয়েই উপভোগ করছে তাদের পঁচিশ তলার এই কুচো বারান্দায় বসে। অনেক নীচে, ছেলেমেয়েদের বিকেলের রং আর হইচই। একটু-একটু ঠান্ডা এবার পড়তে শুরু হওয়া উচিত।

ঋত্বিকের সঙ্গে সময় কাটানো, যতটা বেশি সম্ভব সময় কাটানোই এখন শর্মিলার প্রধান কাজ। এমনকী রুখসারও সে-কথা বারবার করে বলে দিয়েছেন। ওষুধ তো চলছেই, ইনভেস্টিগেশনও চলবে। কিন্তু তাঁর বিশ্বাস, ঋত্বিকের মনের কোথাও অনেক কথা চাপা পড়ে আছে, সেগুলো বলে ফেলতে পারলে, বা তাকে দিয়ে বলিয়ে নিতে পারলে তার মন কিছুটা হলেও হালকা হতে পারে। খুব জোরদার ভাবে না হলেও, সেই চেষ্টা করতে হবে শর্মিলাকেই। বিশেষত তাদের বন্ধুবান্ধব বলতে তেমন কেউই যখন নেই এখানে।

"আগের চেয়ে ভাল লাগছে না একটুও?"

"ডেফিনিটলি। লাগছে তো। তোমার অফিসে প্রবলেম হবে না?"

"আপাতত না। বলে দিয়েছি। ওরা বুঝবে।"

ঋত্বিক বেশ দূরের দিকে তাকিয়ে আছে, যেখানে সামনের দুটো হাইরাইজের মাঝখান দিয়ে দূরের কিছু অবশিষ্ট গাছপালা দেখা যাচ্ছে।

"কী ভাবছ?"

"আচ্ছা শর্মিলা, কলকাতায় সাইপ্রেস হয় না, না?"

"সাইপ্রেস?"

"হুঁ? সাইপ্রেস?"

"সাইপ্রেস তো এ দেশের গাছ নয়। না হওয়ারই তো কথা। কেন?"

"এমনি। জানো, আমার আজকাল নলিনীকাকুর কথা খুব মনে পড়ে।"

"নলিনীকাকু?"

"তোমায় বলিনি আগে, নলিনীকাকুর কথা?"

"উঁহু।"

"আমার একদম ছোটবেলায় যেখানে ভাড়া থাকতাম আমরা, সেই পাড়াতেই থাকতেন। নলিনী রায়। বিয়ে থা করেননি, এই ধরো বছর বাষট্টি বয়স তখন। আমি সেভেনে পড়ি, ভাই থ্রি-তে। আমি অবশ্য ওই পাড়ায় একেবারে জন্ম থেকে আছি, তাই ছোট থেকেই দেখছি নলিনীকাকুকে। অনেকে ছবিকাকু বলেও ডাকত, কারণ উনি খুব ভাল ছবি আঁকতে পারতেন। ইন ফ্যাক্ট, সেটাই ছিল পাড়ায় ওঁর পরিচিতির কারণ। পরে

শুনেছিলাম গভর্নমেন্ট আর্ট কলেজের গোল্ড মেডেলিস্ট ছিলেন। কলকাতার বাইরে একটা স্কুলে পড়িয়েছিলেন কিছুদিন, কিন্তু সে-চাকরি বেশিদিন পোষায়নি।"

"ইন্টারেস্টিং!"

"খুবই। লোকটার চেহারাটাই, জানো, দারুণ ইন্টারেস্টিং ছিল। সারাক্ষণ খদ্দরের ফতুয়া আর ঢোলা সাদা পাজামা পরতেন, পায়ে চটি। ছোটখাটো মানুষ, থুতনিতে অল্প একটু দাড়ি, একটা সাদাটে পাতলা গোঁফ, আর নাকের ডগায় রিমলেস সস্তা একটা চশমা। বারোমাস এইভাবেই আমরা নলিনীকাকুকে দেখতাম। শীতকালে বড়জোর একটা সাদা শাল চাপাতেন। আর জানো, সারাক্ষণ মুখে একটা হাসি। কোনও দিন বিরক্ত হতে দেখিনি আমরা, রাগতেও দেখিনি। হয়তো আপনমনে হেঁটে যাচ্ছেন রাস্তা দিয়ে, তখনও মুখে হাসি লেগে আছে। আমাদের ভারী ভাল লাগত। আমরা মানে ধরো আমি, ভাই, টুকাই, পানু, পাপিয়া, রাজু, বিন্নি, এরা সব যারা বন্ধু ছিলাম। পাড়ার কাকা জ্যাঠাদের তখন দারুণ ভয় পেতাম, ইনক্লুডিং আমার বাবা। বাবাকে দেখলেও বন্ধুরা জাস্ট হাওয়া হয়ে যেত। কিন্তু এই একজন মানুষকে দেখলে আমরা খুশিই হতাম। তার কারণ অবশ্য শুধু নলিনীকাকুর ভাল মেজাজটাই নয়। আসলে ওঁর কাঁধে একটা সাতজন্ম পুরনো ঝোলা থাকত সারাক্ষণ। তার মধ্যে রাজ্যের জিনিস থাকত। অনেকে বলত নলিনীকাকুর ব্যাগ ঘাঁটলে বাঘও বেরোতে পারে। কিন্তু আমরা জানতাম ছবিকাকুর ব্যাগে আর যা-ই থাক না থাক, প্রচুর লজেন্স শিয়োর থাকবে।"

"সিরিয়াসলি? রোজ লজেন্স থাকত?"

"রোজ মানে? সারাক্ষণ! যখনই রাস্তায় দেখা হত, হয়তো হেঁটে যাচ্ছেন আপনমনে, আমরা কোনও না কোনও ছুতোয় জাস্ট সামনে পড়ে গেলাম। ব্যস, থুতনি নেড়ে, 'কী রে, কেমন আছিস'? বলেই ঝোলায় হাত ঢুকিয়ে একটা করে লজেন্স সক্কলের হাতে। তারপর আবার যে কে সেই আপনমনে হাঁটা।"

"এ তো একেবারে অন্যরকম মানুষ।"

"সত্যিই অন্যরকম। এরকম মানুষ এখন আর নেই। এদের কথা শুনলে আজকালকার লোকজন হয়তো হাসবে। ইন ফ্যাক্ট, তখনও পাড়ার দু'-চারজন যে হাসাহাসি করত না তা নয়। সেসব অবশ্য পাত্তা দিতেন না ছবিকাকু। নিজের মনে থাকতেন। পুরনো আমলের শরিকি বাড়ি, একখানা ঘর জুটেছিল, তা-ও ছাদে। তাতেও কোনও অভিযোগ নেই নলিনীকাকুর। সেইখানেই হপ্তায় তিনদিন পাড়ার ছেলেমেয়েদের আঁকা শেখাতেন তিনি। তাতেই যা হত, সেই দিয়ে একার সংসার চালাতেন। ওই ঘরেই রান্নাঘর, আর লাগোয়া

বাথরুম। আমরা কতদিন একটু বেশি সন্ধের পর নাটকের রিহার্সাল থেকে ফেরার সময় ছবিকাকুর ছাদের ঘর থেকে আলু পেঁয়াজ ভাজি রান্নার গন্ধ পেতাম...”

“তুমি শিখতে, আঁকা?”

“হ্যাঁ, তখন তো এত কেরিয়ার-কেরিয়ার ব্যাপার ছিল না, মায়ের উৎসাহেই ভরতি হয়েছিলাম। তবে একটা কাণ্ড ঘটেছিল, যেটা না হলে হয়তো ভরতি হতাম না, বা এতটা স্বপ্ন দেখতাম না আর কী। এনিওয়ে...”

“আরে থামলে কেন, বলো?”

“তোমার ভাল লাগছে শুনতে? এত সব পুরনো কথা...”

“আর এক কাপ কোকো বানিয়ে আনলে বিশ্বাস করবে?”

“না না... বোসো। সেই যখন ক্লাস ফাইভে পড়ি, পাড়ার বসে আঁকো প্রতিযোগিতায় নাম লিখিয়েছিলাম। বছরে তিন-চারটে তো লেগেই থাকত। সকাল থেকে মাইকে ঘোষণা করে-টরে সে একেবারে এলাহি ব্যাপার! সব পাড়াতেই হত তখন, তুমিও নির্ঘাত দেখেছ। মাঠে শতরঞ্চি পেতে ছোটদের বসার ব্যবস্থা, আর একদিকে চাঁদোয়া খাটিয়ে বিচারকেরা বসে চা-বিস্কুট খাচ্ছেন। সামনে তিনটে কাপ রাখা, ফার্স্ট, সেকেন্ড আর থার্ড। তার পাশেই চকমকে পেপারে মোড়া তিন থাক বই। ওইটাই ছিল আসল উদ্দেশ্য, যদি বই পাওয়া যায়!”

“তুমি পেয়েছিলে?”

“আরে আমি তো তার আগে কোনওদিন নামই লেখাইনি। সেবার পরীক্ষা শেষ হয়ে গিয়েছে, প্লাস জন্মদিনে একটা ড্রয়িং বুক আর প্যাস্টেল কালার সেট গিফ্‌ট পেয়েছি। আর পায় কে! নাম লিখিয়ে এলাম সকাল-সকাল। আমাদের পাড়ায় এমনিতে কিন্তু ছবিকাকুকে সকলে খুব সম্মান করত। তাই বসে আঁকো জাতীয় ব্যাপার হলে ছবিকাকুই হবেন প্রধান বিচারক, এটা মোটামুটি একটা রিচুয়াল ছিল। ছবিকাকুও ব্যাপারটা খুব এনজয় করতেন। সকাল-সকাল পাটভাঙা ফতুয়া আর পাজামা পরে তদারক করতে হাজির হয়ে যেতেন। আরও দু’-একজন বিচারক হয়তো আসতেন বাইরে থেকে, কিন্তু পাড়ার ক্লাবের কাছে ছবিকাকুর কথাই ফাইনাল।”

“তা সেবার তুমি কী এঁকেছিলে?”

“সেটাই বলছি। বিষয় ছিল ল্যান্ডস্কেপ। তা যেমন তখন বাচ্চারা আঁকে আর কী। দুটো বাড়ি, দুটো পাহাড়, তাদের মাঝখান থেকে সূর্য উঠছে, আর চারটে পাখি আকাশে।”

“এই, এইটা কিন্তু আমিও এঁকেছি ছোটবেলায়!”

"এইটা সক্কলে এঁকেছে। বিলিভ মি!"

"আচ্ছা, তারপর বলো..."

"তা আমি তো এঁকে-টেকে জমা দিয়ে বাড়ি চলে এসেছি, জানিই যে কিছু হব না। দু'ঘন্টা পরে আবার মাঠে গেলে রেজাল্ট জানা যাবে। তা মা নিয়ে গিয়েছে বেলার দিকে। নাম ঘোষণা হবে। ও মা, গিয়ে দেখি আমি ফার্স্ট হয়েছি!"

"এটা আমি আন্দাজ করেছিলাম ঋত্বিক। তোমার আঁকার হাত বরাবর ভাল। আমি তো তোমার আগের কাজগুলো দেখেছি..."

"আরে পুরোটা শোনো। সেজন্য নয়। আমার চাইতে ভাল অনেকেই এঁকেছিল। কিন্তু ছবিকাকুর ডিসিশন, আমাকেই ফার্স্ট প্রাইজ় দিতে হবে। কেন জানো?"

"কেন?"

"কারণ আমিই একমাত্র, যে নাকি পাহাড়ের রং নীল আর আকাশ বাদামি করেছিলাম। মানে জাস্ট যা হবার কথা তার উলটো!"

"কী বলছ?"

"সিরিয়াসলি! ছবিকাকু প্রাইজ় দেওয়ার সময় মাকে বলেছিলেন, আমার এখনও মনে আছে, 'অর্পিতাদি, আপনার ছেলের ইম্যাজিনেশন আছে। ওর হবে। পাঠাবেন...' ব্যস, এইটুকু।"

"আকাশ বাদামি আর পাহাড় নীল? বাহ্, দারুণ তো! সত্যিই তো, এভাবে সকলে ভাবতে পারে না। তোমার ছবিকাকু ওয়াজ় রাইট।"

"শর্মিলা, ওটা একটা ক্লাস ফাইভের ছেলে এঁকেছিল বলে ইম্যাজিনেশনের প্রশংসা হয়েছিল। এই সাঁইত্রিশ বছরের লোক সেটা আঁকলে হ্যালুসিনেশন বলা হত। ইউ নো দ্যাট ভেরি ওয়েল। ইটস অল রিলেটিভ।"

শর্মিলা এই উত্তরখানা আশা করেনি এই সময়ে। সে কথা না বাড়িয়ে ঋত্বিকের পিঠে হাত রাখল আলতো করে। সন্ধে হয়ে আসছে, নীচের বাচ্চারা খেলাধুলো শেষ করে যার যার দরজার দিকে উঠে যাচ্ছে। শর্মিলা বুঝতে পারছে, রুখসার ভুল বলেননি। কোথাও অনেক কথা আটকে আছে। একটু ঠান্ডা হাওয়া দিচ্ছে এবার। দূরে মাল্টিপ্লেক্সের ছাদের আলোগুলো জ্বলে উঠেছে এতক্ষণে। একটা চাদর ও আরেক কাপ কোকো ঋত্বিকের দরকার।

১১

হলুদ বাড়ি, প্লেস লা মার্টিন, ফ্রান্স
এপ্রিল, ১৮৮৯

মনকে সুস্থ করে তোলা যে তাঁর কাজ নয়, সে কথা বুঝে গিয়েছেন ভিনসেন্ট। হাসপাতাল থেকে ছাড়া পেয়ে বাড়িতে এসেছেন ঠিকই, কিন্তু স্বস্তি নেই। হলুদ বাড়িতে একা-একা দিন কাটাচ্ছেন কোনও মতে। খুশির ব্যাপার একটাই, শীত পার করে বসন্ত এসেছে প্রতিবারের মতো, সেইসঙ্গে সে এনেছে গাছ ভরতি করে ফুল আর ফল, যা নাকি ভিনসেন্ট আঁকতে পারবেন মনের সুখে। কিন্তু মনের সুখ বলতে ওইটুকুই কেবল। তার বাইরে নিজেকে, নিজের ভিতরকার প্রাণীটিকে বুঝে উঠতে পারছেন না তিনি কিছুতেই। তার জেদ, তার পাগলামো, তার অবাধ্যতা, তার হিংস্রতার সঙ্গে এঁটে উঠতে পারছেন না। হেরে যাচ্ছেন। কখনও ভাল থাকছেন বই কী। কিন্তু কতক্ষণ? যতক্ষণ তাঁর হাতে তুলি আর সামনে ক্যানভাস। সেসব সরে গেলেই কী যে হচ্ছে! অচেনা একজন লোক হয়ে উঠছেন তিনি নিজের সামনেই। আয়নায় নিজেকে দেখে মনে হচ্ছে নীল চোখওয়ালা কোথাকার কোন মানুষ, যার সঙ্গে ভিনসেন্টের কোনও মিল নেই। এমনকী আলাপও নেই একটু।

অবশ্য এই বদলে যেতে থাকা চেহারার প্রত্যেক ক'টাকেই তিনি ধরে-ধরে নিজের হাতে এঁকে রেখেছেন। এখন তাঁর সংগ্রহে আত্মপ্রতিকৃতির সংখ্যা নেহাত কম হবে না। আর একটা থেকে একটায়, এখন তাকালে, হাড় হিম করা একটা বদল দেখতে পান ভিনসেন্ট। প্রাণ থেকে নিষ্প্রাণে যাত্রা। নিজের শেষ যে-ছবিখানা এঁকেছেন তিনি, তাতে চোখের কোটর থেকে ঠেলে বেরোতে চাওয়া নীল মণিতে যে-আলো ধরা পড়েছে, তা মৃত্যুর অন্ধকার ছাড়া আর কী-ই বা হতে পারে?

হ্যাঁ, তিনি ফুরিয়ে যাচ্ছেন। এ কথা টের পাচ্ছেন ভিনসেন্ট। মৃত্যু খুব দূরে নেই। কিন্তু এই পাগলামোর আগুন নিয়ে তিনি মোটেই পৃথিবী ছেড়ে চলে যেতে চান না। মৃত্যু এলে তাকেও যেন যথাযথ সম্ভাষণ জানাতে পারেন, যেন পৃথিবীর অন্যতম শ্রেষ্ঠ শিল্পীর মৃত্যুই তাঁর ভাগ্যে আসে, এমনটাই চাইছেন তিনি এখন।

এপ্রিলের এই ঝকঝকে বিকেলটায় হলুদ বাড়ির জানলা দিয়ে মুখ বাড়িয়ে দেখছিলেন তিনি। তাঁর বেঁচে থাকাটাও যদি তিনি এই বসন্তের বিকেলের মতোই করে তুলতে পারতেন! বদলে সবটা কেমন যেন এক বিশ্রী ষড়যন্ত্রের মতো হয়ে গেল। বেঁচে থাকার প্রতি এই যে নির্মম ভালবাসা, সেটাই ভিনসেন্টকে এক মানুষ থেকে আর এক মানুষ, এক ঠিকানা থেকে আর এক ঠিকানায় তাড়িয়ে মারল, আজ এমনটাই মনে হয় ভিনসেন্টের। এক-একদিন রাতে গণিকাদের বিছানায় যখন ক্লান্ত হয়ে এলিয়ে পড়েন আর তাদের কেউ-কেউ তাঁর এলোমেলো সোনালি চুলে হাত বুলিয়ে দেওয়ার চেষ্টা করে, ভিতর থেকে খেপে ওঠেন ভিনসেন্ট। তিনি ভাবতেন মাথার আগুন বুঝি বীর্যের সঙ্গে বেরিয়ে যায়। সঙ্গম নিশ্চয়ই সব ঠান্ডা করে দেয়। কিন্তু ভিনসেন্টের তা হত না। গণিকারা মুখ বদলে বদলে আসে একের পর এক রাত। এ ছাড়া আর কিছু বদলায় না।

শেষ যে-আশাটুকু করেছিলেন তিনি, এই হলুদ বাড়িকে সত্যি-সত্যি মনে রাখার মতো শিল্পী শিবির করে তুলবেন, সেটুকুও এখন সঙ্গ ছেড়েছে। কত আশা নিয়েই না আর্ল-এ এসেছিলেন তিনি। আর এখন, এই বিকেলবেলায়, নিজেকে একজন বিষণ্ণ আর নিঃসঙ্গ মানুষ বলে চিনতে পারলেন ভিনসেন্ট।

কেবল তাঁর ভিতরকার ওই একটা খ্যাপা মানুষকে একবার চিনে নেওয়া চাই। সে-ব্যবস্থাও ভিনসেন্ট নিজে হাতেই করেছেন, এটুকু ভেবেই এখন শান্তি হচ্ছে তাঁর।

আর শান্তি হচ্ছে থিও-র কথা ভেবে। থিও সেই আশ্চর্য সুড়ঙ্গের মতো, যার একদিকে তিনি, আর একদিকে তাঁর পরিবার আর বাকি পৃথিবী। সে না থাকলে কবেই সবকিছু থেকে একেবারে ছিঁড়েখুঁড়ে বেরিয়ে আসতেন তিনি। এমনকী এই যে তাঁর আঁকা, এই যে ফুটে থাকা অর্চার্ড আঁকবেন ভাবছেন জানলায় দাঁড়িয়ে, সেই ভাবনাটুকুই বা তিনি পেতেন কোথায়?

"তুমি তা হলে কিছুই করবে না বলে ঠিক করেছ?"

বাবার রাগী আর থমথমে মুখখানা আজও চোখ খোলা রেখেই দেখতে পান ভিনসেন্ট। এই এখন যেমন পাচ্ছেন অবিকল। কত বছর আগের রাত ছিল সেটা? বেশ শীত পড়েছিল সেবারেও। তার আগের বছরই বাড়ি ছেড়েছেন ভিনসেন্ট, আঁকার নেশা তাঁকে ঘুরিয়ে মারছে। সেইসঙ্গে উপার্জনের ভাগ্য খুঁজে বেড়াচ্ছেন এ গলি-সে গলি। আসতেন না বাড়িতে, যদি না থিও চিঠি লিখে তাঁকে অনুরোধ জানাত, 'শীতকাল, বড়দিন, একবার ঘুরে যেয়ো।' তখনও ভিনসেন্ট আশা করতেন, একজন স্বাভাবিক ছেলের মতোই, বাবা আর মা তাঁকে নিশ্চয়ই একদিন বুঝবেন। বিশেষত বাবা। মা, ভিনসেন্ট যেন-বা আন্দাজ করতে পারতেন, মন থেকে একরকম সমর্থনই জানাচ্ছেন তাঁকে। কেবল বাবার দাপুটে গলার

আওয়াজে তাঁর সমর্থন চাপা পড়ে যাচ্ছে। সেই শীতকালীন ছোট্ট নৈশভোজের সময়েও যেমনটা হয়েছিল।

ভাই-বোনেরা সকলেই ছিল সেই রাতে, ছিলেন মা আর বাবাও। যদ্দুর ভিনসেন্টের মনে পড়ছে, তিনি বসেছিলেন মাঝখানের এক চেয়ারে। হাতের সামনের পাত্রে গরম সুপ থেকে ধোঁয়া উঠছে, সেইসঙ্গে সামনে রাখা পাঁউরুটি। এমন সুস্বাদু খাবার কতদিন খায়নি ভিনসেন্ট। রুটি ছিঁড়ে সে সুপে ডুবিয়ে নিতে যাবে, এমন সময়ে বাবার গলায় এই প্রশ্ন। বাইরে তখন বরফ শুরু হয়েছে অল্প।

"তুমি তা হলে কিছুই করবে না বলে ঠিক করেছ?"

সুপের বোল-এর দিকে তাকিয়েই প্রশ্নটা করেছিলেন বাবা, কিন্তু ঘরের কারও আর বুঝতে বাকি নেই যে উত্তর কার কাছ থেকে আশা করা হচ্ছে।

"করছি তো। আঁকছি।"

"আমি কাজের কথা বলছি ভিনসেন্ট। কোনও ভদ্র কাজ যা করে উপার্জন করা যায়।"

ঘরের বাকিরা এমনটা চাননি। তাঁরা সকলেই খোশমেজাজের গল্পে ভরপুর একখানা সুস্বাদু নৈশভোজ আশা করছিলেন এই কিছুক্ষণ আগেও। এখন সকলেই বুঝেছেন, আজ রাতে তা হওয়ার জো নেই।

"আঁকলে উপার্জন হয় না, এ কথা আপনাকে কে বলেছে বাবা?"

বাকি ভাই-বোনেদের আর কেউ এরকম উত্তর দেওয়ার স্পর্ধা দেখাত না। বরং চুপ করেই থাকত। থিও প্রমাদ গুনল টেবিলের অন্যপ্রান্তে বসে। ভিনসেন্টকে ডেকে পাঠানোটা মোটেই বুদ্ধিমানের কাজ হয়নি। ভিনসেন্ট বাড়িতে থাকা মানে কোনও না কোনও সময়ে ঝগড়াঝাঁটি হবেই এবং তারপর গোটা বাড়ি তিন-চারদিন থমথমে হয়ে থাকবে, যা থিও-র ভাল লাগত না মোটেই। মনে-মনে অবশ্য সে তার এই আঁকিয়ে দাদাকে সমর্থনই করত আর বাবার প্রশ্নের সামনে তাকে হেনস্থা হতে দেখতেও ভাল লাগত না।

"ওহ্, উপার্জন হয় বুঝি? দুঃখিত তা হলে। তথ্যটা জানা ছিল না আমার। তা কীরকম উপার্জন হচ্ছে তোমার? বাড়ির খরচাপাতির জন্যে এবারে কিছু দিয়ে যেতে পারছ কি?"

বাইরের শৈত্যপ্রবাহও ওলন্দাজ ভাষার এই ঠান্ডা শ্লেষের কাছে হার মেনে যাবে নিশ্চিত।

ভিনসেন্ট চুপ।

বাবা চুপ।

থিও চুপ।

মা চুপ।

বাকি ভাই-বোনেরা চুপ।

চামচের আওয়াজ নেই।

কাঁটার আওয়াজ নেই।

ঘড়ির টিকটিক একটা আওয়াজ।

খুব দূরে কোথাও এক কুকুর বেশ কিছুক্ষণ ধরে ডাকল।

তার রাতের খাওয়া হয়ে গিয়েছে।

রেলব্রিজ ধরে একটা ট্রেন বয়ে গেল। শীতের চেয়ে ভারী নয় তার শব্দ।

"নাহ্, এখনই পারছি না, কিন্তু শিগগিরই পারব আশা করছি। আর ক'টা দিন সময়..."

"আর কত সময় চাও তুমি ভিনসেন্ট? তুমি কি দেখতে পাচ্ছ না যে তোমার ছবিগুলোর কোথাও কোনও কদর নেই? প্যারিসের বাজারে কাদের ছবি এখন বিক্রি হয় জানো না? তোমার কি ধারণা তুমি তাদের ধারেকাছেও পৌঁছোতে পারবে কোনও দিন?"

"পারব। আমি জানি।"

থিও চোখ বুজল। এর পরের অংশটুকু তার জানা আর তাই সে শুনতেও চায় না ওসব। কিন্তু এখন টেবিল ছেড়ে উঠে যাওয়ার উপায় নেই কোনও।

"আচ্ছা? জানো তুমি? তা ফিরে গিয়ে কী করবে?"

"আমি ঠিক করেছি আমি চাষিদের সঙ্গে কিছুদিন থাকব। আলুচাষিদের সঙ্গে।"

"আমার ছেলে শেষমেশ আলু চাষ করবে?"

"চাষ করতে পারলে খুশি হতাম, কিন্তু ওটা সবার দ্বারা হয় না। আমি ওদের জীবন আঁকতে চাই। এই শহরে বসে সেটা সম্ভব নয়।"

"বাহ্, আর তোমার সেইসব আলুচাষিদের নিয়ে আঁকা ছবি নিশ্চয়ই প্যারিসের জাদুঘরে শোভা পাবে?"

"আমি জাদুঘরের জন্যে আঁকি না বাবা। নিজের জন্যে আঁকি।"

"যথেষ্ট সময় তোমাকে দেওয়া হয়েছে ভিনসেন্ট। এইসব আজগুবি কথায় তুমি তোমার ছোট ভাইকে বোকা বানাতে পারো, আমাকে নয়। তার চেয়ে এখনও সময় আছে, আমি পাদ্রিমশাইয়ের সঙ্গে কথা বলেই রেখেছি, এখানকার গির্জায় তোমার একখানা কাজ হয়ে যাবে। ধর্ম প্রচারের চেয়ে মহৎ কাজ কিছু হয় না। মন দিয়ে ঈশ্বরের কাজ করো, মানুষেরও ভাল হবে, তোমারও ভাল হবে। বুঝেছ?"

"আপনার ধর্মের কাজ আগে করে দেখে নিয়েছি আমি। ওতে আমার কোনও মুক্তি নেই। এখন আমি আমার ধর্মের কাজই করছি বাবা। আপনি জানেন।"

"চুপ করো বেয়াদপ ছেলে!" টেবিল চাপড়ে বলে উঠলেন বাবা, "যে এখনও বাইবেল পুরোপুরি পড়েনি তাকে আমি নিজের ছেলে হিসেবে ভাবতে লজ্জা বোধ করি। যিশু তোমাকে কখনও ক্ষমা করবেন না।"

"প্রয়োজন নেই বাবা। আমার ঈশ্বর চার্লস ডিকেন্স। আপনি পারলে 'নিকোলাস নিক্‌লবি' পড়ে দেখবেন। শুভরাত্রি সবাইকে।"

নিজের চেয়ার ঠেলে সরানোর কর্কশ আওয়াজটা এই বিকেলে দাঁড়িয়েও বহু বছর আগের রাত থেকে শুনতে পেলেন ভিনসেন্ট। বাবার মতো একজন মানুষ তাঁর পৃথিবীতে ছিলেন, আর তিনিই ভিনসেন্টের অন্যতম জন্মদাতা, এ কথা আজও তাঁর বিশ্বাস হয় না। মনে আছে ভিনসেন্টের, সে-রাতে চারপাশ বরফ পড়ে সাদা হয়ে গিয়েছিল। পরদিন সকালে যখন কারও সঙ্গে দেখা না করেই সুটকেস বেঁধে বেরিয়ে যাচ্ছেন তিনি, একটা হামিংবার্ডকে মরে পড়ে থাকতে দেখেছিলেন তাঁদের দরজার সামনে।

সন্ধে নেমে এসেছে প্লেস লা মার্টিনে। আর খুব বেশিদিন এই সন্ধে দেখতে পাবেন না ভিনসেন্ট। তিনি নিজেই সে-ব্যবস্থা করেছেন। ভিতরের এই অবাধ্য আগুনের একটা হদিশ না পেলে এবার ভারী ক্লান্ত লাগছে তাঁর। থিওকে তিনি নিজেই জানাবেন ভেবেছিলেন, কিন্তু খবরটা হাত ঘুরে তার কাছে পৌঁছেছে। নিশ্চয়ই বেচারা আহত এবং তাঁর উপর রাগও করছে খুব। এইবেলা তাকে তাড়াতাড়ি একখানা চিঠি লিখে ফেলা দরকার। জানলার ধারে টেবিলের উপর ঝুঁকে পড়লেন ক্লান্ত ভিনসেন্ট। থিওকে তাঁর অনেক কথা জানানোর আছে।

১২

অ্যাপার্টমেন্ট ২৫বি, স্কাইরাইজ়, কলকাতা
নভেম্বর ২০১৭

আর এক কাপ গরম কোকো পেয়ে ঋত্বিক খুশি হল কি না বোঝার উপায় নেই। কারণ তার মুখে আর কোনও আলো পড়ছে না। শর্মিলা আজ বাড়ির আলোগুলো এখনও জ্বালেনি। যেমন আছে, থাক। তাতে যদি ঋত্বিকের কথা বলতে একটুও সুবিধে হয়, আপত্তি নেই। দূরের দিকে তাকিয়েই বলে যেতে থাকল ঋত্বিক, "সবই আপেক্ষিক। এখন আই কান্ট অ্যাফোর্ড টু পেন্ট স্কাই ব্রাউন। মজার অঙ্ক, না? এনিওয়ে, সেই আমার শুরু হল ছবিকাকুর বাড়িতে যাওয়া। মঙ্গল আর শনি সকাল সাড়ে দশটা থেকে একটা। বাবার যে বিষয়টা দারুণ পছন্দ ছিল তা নয়, মাকে কেবল বলেছিলেন, পড়াশোনার যেন কোনও ক্ষতি না হয়। ইন ফ্যাক্ট, পড়াশোনার জন্যও যে আঁকার ক্ষতি হতে পারে, সেই ইম্যাজিনেশন আমার বাবার ছিল না কোনওদিনই। কিন্তু আমার ভারী ভাল লাগত ছবিকাকুর ক্লাস। আমরা সাতজন ছিলাম। নানা গল্প হত। কোনও-কোনও দিন হয়তো রঙের বাক্স খোলাই হল না, ছবিকাকু কেবল দেশ-বিদেশের শিল্পীদের কথা বলে গেলেন। আমরা সেসব হাঁ করে গিলতাম। পাড়ায় আর কেউ তো কখনও এসব কথা বলেনি! ছবিকাকু আমাদের কাছে ম্যাজিশিয়ানের মতো হয়ে গেলেন। কী কষ্ট করে থাকতেন, আমরা তো দেখেছি। ওই এক চিলতে ছাদের ঘর, তার মধ্যে একটা কাঠের চারপায়ায় চাদর পেতে শুতেন। ওটায় বসেই আমাদের ক্লাস নিতেন। সামনে গোটা দশেক টিনের চেয়ার আর টেবিল, আমরা তাতে বসতাম। এক কোণে দেখতাম স্টোভ আছে, রাতে ওতেই রান্না হবে। আর দেখতাম, আমাদের পড়াতে-পড়াতে ওঁর মুখটা কীরকম আলোয় ভরে উঠত। সামান্য টাকা উনি নিতেন ঠিকই, কিন্তু ওই যে আমাদের সঙ্গে একটা গোটা সকাল গল্প করছেন, ওটাই ছিল ওঁর নেশা।"

"কী অন্যরকম মানুষ, না?"

"ট্রুলি অন্যরকম মানুষ শর্মিলা। পরে আমার মনে হয়েছে, কী তৃপ্ত একজন মানুষ ছিলেন নলিনীকাকু। কী ব্রিলিয়ান্ট একজন আর্টিস্ট, ওইরকম রেজ়াল্ট... কিন্তু দ্যাখো,

আর্টিস্ট হিসেবে কেউ তো চিনল না, পাড়ার ক'জন ছাড়া। বাসস্টপ থেকে বাসে উঠলেই আর পাঁচটা লোকের সঙ্গে ছবিকাকুর কোনও তফাত নেই। পরে মনে হত, ওঁর কি কোনও অ্যাম্বিশন ছিল না? নামডাক হওয়ার স্বপ্ন ছিল না? এই যে জাস্ট অ্যানাদার ফেস ইন দ্য ক্রাউড হয়ে থেকে গেলেন সারা জীবন, এর জন্য ফ্রাস্ট্রেশন ছিল না? আমরা হলে তো চেপে রাখতে পারতাম না অ্যাট লিস্ট। কিন্তু ছবিকাকু সেইসব না-পাওয়াগুলো কী সুন্দর মানিয়ে নিয়েছিলেন। আমাদের সঙ্গে ওঁর সকালগুলোয় উনি পুরো অন্য মানুষ হয়ে যেতেন। জানো, পয়সা জমিয়ে বই কেনা ছিল ওঁর নেশা। 'গ্রেট আর্টিস্টস' বলে একটা সিরিজ় বেরোত তখন, বিদেশি কোনও পাবলিকেশন থেকে..."

"হ্যাঁ, হ্যাঁ, আমি দেখেছি তো। এখনও গড়িয়াহাটের পুরনো বইয়ের দোকানে পাওয়া যায়।"

"এগজ্যাক্টলি। মাসে-মাসে ওই বইগুলো ফ্রেশ কিনে আনতেন। আর সেসব বই খুলে ছবি দেখাতেন আমাদের। বেসিক্যালি স্বপ্ন দেখাতেন। শোনাতেন এক-একজন শিল্পীর জীবনের দারুণ সব ঘটনা। ওইরকম এক শনিবার সকালেই আমি প্রথমবার 'দ্য স্টারি নাইট' দেখি।"

"ছবিকাকুর কাছে?"

"ছবিকাকুর কাছে। ভিনসেন্ট ভ্যান গঘের উপর সংখ্যাটা কিনেছেন আগের হপ্তায়। ব্যস, সেই শনিবার আর তার পরের মঙ্গলবার আমরা সকলে মজে থাকলাম ভ্যান গঘের জীবন আর তাঁর আঁকায়। ওই বইটার একদম মাঝের পাতায়, মানে ডাবল স্প্রেডের এ মাথা ও মাথা জুড়ে গ্লসি কাগজে ঝকঝকে ছাপা ছিল দ্য স্টারি নাইট। ওই ছবিটা, বিলিভ মি শর্মিলা, আমার ভাবনাচিন্তা থেকে শুরু করে অনেক কিছু পালটে দিয়েছিল।"

"আই নো ঋত্বিক।"

"এক-একদিন দুপুরবেলায় আমি ছবিকাকুর ছাদের ঘরে গিয়ে উঁকি দিতাম। উনি কিন্তু বিরক্ত হতেন না। নিজের কাজ করতেন। আমি শেলফ থেকে ভ্যান গঘের বইটা নামিয়ে ঘণ্টার পর ঘণ্টা শুধু স্টারি নাইটের দিকে তাকিয়ে থাকতাম। কিছুক্ষণ তাকানোর পর মনে হত আমি যেন ছবিটার মধ্যে চলে গিয়েছি। একদিন, আমার মনে আছে, ছবিকাকু আমার মাথায় হাত রেখে বলেছিলেন, আমার তো দেখা হল না, তুই বড় হয়ে সামনে থেকে দেখে আসিস, কেমন? তা হলেই আমারও দেখা হবে।"

"কী ভালবাসতেন তোমাকে! ইস..."

"হ্যাঁ, সামহাউ ওঁর মনে হয়েছিল আমার দ্বারা আঁকাটা হবে।"

"তারপর?"

“তারপর আমি ছুটির দুপুরগুলোয় লুকিয়ে-লুকিয়ে ওঁর ছাদের ঘরে যাওয়া শুরু করলাম। শুধু ভাই জানত সেসব। মা-বাবা অফিস থেকে ফেরার আগে আবার বাড়িতে এসে পড়ার বই খুলে চুপ করে বসে থাকতাম। কেউ কিছু টের পেত না। কিন্তু ওই দুপুরগুলো আমার কাছে ট্রেজার হান্টের মতো ছিল। কিছুদিন পর বুঝলাম, ছবিকাকুও ভ্যান গঘ আর তাঁর ছবির ব্যাপারে প্রায় অবসেস্‌ড। তখন তো অত ইংরেজি বই পড়ার অভ্যেস হয়নি, কিন্তু তা-ও, এক-একদিন দুপুরে উনি আরভিং স্টোনের ‘লাস্ট ফর লাইফ’ থেকে পড়ে শোনাতেন। যেসব অংশ ওইটুকু বাচ্চাকে শোনানো যায় আর কী। আমি হাঁ করে শুনতাম। আর ভাবতাম, আমাদের এই ছোট্ট পাড়াটা থেকে ঠিক কত দূরে হবে ভ্যান গঘের বাড়ি? তারপর ভাবতাম, কিন্তু তিনি তো আর নেই সেখানে! মন খুব খারাপ হয়ে যেত। কিন্তু এসবের মধ্যে দিয়েই, আমার আর ছবিকাকুর একটা আলাদা সম্পর্ক তৈরি হয়ে গিয়েছিল। আমার মনে-মনে বেশ গর্ব হত এই ভেবে যে, পাড়ার আর কোনও বাচ্চা ছবিকাকুর সঙ্গে এত সময় কাটাতে পায় না।”

“বিয়ে করেননি কেন?”

“কে জানে... অনেক পরে শুনেছিলাম কোনও এক ছাত্রীর সঙ্গে সম্পর্ক ছিল। কিন্তু সেই নিয়ে খুব জটিলতা হয়। পাড়ায় জানাজানি হয়ে চূড়ান্ত অশান্তি... ক’দিন নাকি বাইরে গিয়েও থাকতে হয়েছিল। বোঝোই তো। তিরিশ বছর আগের মিড্‌ল ক্লাস পাড়া। তার ওপর শরিকি অশান্তি তখন চরমে। কোনও রকমে ওই একটা ঘর ভাগে পেয়েছিলেন ছবিকাকু। শুনেছি মাস পাঁচেক পাড়ায় ফেরেননি। তারপর ফিরে ওই ঘরেই থাকতেন একা। স্কুলের চাকরিটাও নাকি ছেড়ে এসেছিলেন। তার বছরখানেক পর বাড়িতে শেখানো শুরু করেন।”

“কী অদ্ভুত একটা জীবন, না?”

“হ্যাঁ। কিন্তু আমার পরে মনে হয়েছিল, ছবিকাকুরও অনেক অ্যাম্বিশন ছিল, জানো? ওইরকম ব্রিলিয়ান্ট রেজাল্টের পর এইরকম একটা জীবন তো হওয়ার কথা নয়, তাই না? কিন্তু সামহাউ ওটাই ছবিকাকুর জীবন ছিল। তাই দুপুরে আমি যখন গল্প শুনতে আর ছবি দেখতে যেতাম, উনি প্রত্যেকদিন আমাকে বলতেন, তুই কিন্তু আঁকা ছাড়বি না। লড়ে যাবি। আমার মতো হাল ছেড়ে দিবি না কিন্তু, কেমন? তোর হবে। এই দ্যাখ, এই মানুষটার জীবনে... বলে আবার ভ্যান গঘের গল্প শোনাতেন। কী অসম্ভব বিরুদ্ধতার মধ্যেও ভ্যান গঘ একের পর এক মাস্টারপিস তৈরি করে গিয়েছেন, সেই গল্প শোনাতেন। এইভাবে টানা এক বছর চলল।”

“তারপর?”

"তারপর আর কী! তখন আমার ক্লাস নাইন। সেদিনটা ছিল স্কুলের শেষ দিন, তারপরেই পুজোর ছুটি পড়ে যাচ্ছে। স্কুল শেষ হয়ে গিয়েছে, আমি আর ভাই পাড়ায় ফিরছি হাত ধরাধরি করে। পাড়ার মোড় থেকে বাড়ি ফিরতে হলে ছবিকাকুদের বাড়ির সামনে দিয়েই আসতে হত। একটু এগিয়েই দেখি লোকজনের জটলা। তখনও বুঝিনি। কাছে গিয়ে দেখি ছবিকাকুকে ধরে ছাদের ঘর থেকে নামাচ্ছে পাড়ার দাদারা। আমি আর ভাই তো দাঁড়িয়ে পড়েছি। ছবিকাকু অসুস্থ মানে আমারও মনখারাপ। তখনও মা-বাবা অফিস থেকে ফেরেনি। নামিয়ে এনে ওরা একতলার বারান্দায় রেখেছে ছবিকাকুকে। বড্ড ভিড়। আমি আর ভাই বারান্দার গ্রিলের এপার থেকে মুখ ঠেকিয়ে দেখছি। কারা সব বাড়ির ভিতর থেকে বারান্দায় বেরিয়ে এসেছে। আগে কোনওদিন দেখিনি, ছবিকাকুর ভাই-বোনেরাই হবে। দেখি পাড়ার মোহিনী ডাক্তারকে কারা ডেকে নিয়ে এসেছে। আমি তখন ভাবছি পরশুই শনিবার, আমার তা হলে একটা ক্লাস হবে না। তারপর দেখছি, ছবিকাকুর ঠোঁটের পাশ দিয়ে সাদা মতো কী গড়াচ্ছে..."

"কী বলছ? মাই গড..."

"মোহিনী ডাক্তার মাথা নাড়লেন। নেই। শেষ। দুপুরে ছাদের ঘরে ইঁদুর মারার বিষ খেয়েছেন।"

"ইস... কেন?"

"কেউ জানে না। আমাদেরও কখনও কিছু বুঝতে দেননি। তার দু'দিন আগেও স্কুল থেকে ফেরার পথে একবার দেখা করে এসেছি, হেসেই কথা বলেছেন... তারপর এই!"

"মানুষের যে কখন কী মনে হয়..."

"হয়তো অনেক দিন ধরেই মনে হয়েছিল, জানো শর্মিলা। এখন আমার মনে হয়, অনেক দিন ধরেই এই জীবনটা চাইছিলেন না ছবিকাকু। কোনও দিনই চাননি। কিন্তু মানুষের তো সময় লাগে। নিজেকে শেষ করে ফেলার সিদ্ধান্ত নিতে মিনিমাম একটা সময় লাগে। হয়তো অনেকদিন ধরেই সেই প্রসেসটা ভিতর-ভিতর চলছিল। সেইদিন দুপুরে হি সাকসিডেড।"

"তুমি খুব শক্‌ড হয়েছিলে ফর শিয়োর!"

"সারা রাত কেঁদেছিলাম। মা বুঝেছিল, খুব বুঝিয়েছিল। কিন্তু এইভাবে ছবিকাকুর চলে যাওয়াটা কিছুতেই আমার মাথা থেকে যেতে চাইছিল না। তিন-চারদিন ভাল করে খাইনি আমি। শুনতাম, মা আর বাবা কথা বলছে এই নিয়ে। আমি ওই দুপুরগুলো মিস করতাম খুব। ওই আড্ডা আর ছবির বইগুলো। সেসব বইও একদিন ছবিকাকুর ভাইরা মিলে বিক্রি

করে দিল, ছাদের ঘরটা বাড়িয়ে নিয়ে দুটো ঘর তুলে নিল। এসব ছ'মাসের মধ্যে হল। কিন্তু পাড়ায় আর কোনও দিন বসে আঁকো প্রতিযোগিতা হল না।"

"খুব স্বাভাবিক।"

"কিন্তু কী জানো, ছবিকাকু যাবার সময়ে আমার সবচাইতে বড় ক্ষতিটা করে দিয়ে গেলেন।"

"সে কী, কেন?"

"তখন বুঝিনি অবশ্য। পরে যখন গভর্নমেন্ট আর্ট কলেজের ফর্ম তুলে এনে বাড়িতে জানালাম, তখন বুঝলাম।"

"মানে?"

"বাবা ফর্মটা দেখে একটাই কথা বললেন। আমাকে নয়, সামনে দাঁড়িয়ে থাকা মাকে, অর্পিতা, আমি আমার বাড়িতে দ্বিতীয় নলিনী রায় চাই না। ছবিকাকুর জীবনটা বাবা মনে রাখেননি। রাখার মতো জীবনও হয়তো নয়, অন্তত আমার বাবার মতো মানুষের কাছে। কিন্তু ছবিকাকুর মৃত্যুটা বাবাকে জিতিয়ে দিয়েছিল। ছবি এঁকে গোল্ড মেডেল পেলেও যদি কাউকে আত্মহত্যা করতে হয় শেষমেশ... বুঝতেই পারছ।"

"ওঁর চিন্তাটাও স্বাভাবিক।"

"খুব ঝামেলা করেই ভরতি হয়েছিলাম। কিন্তু... কে জানে। হয়তো আমিও ছবিকাকু হয়ে উঠতে চাইনি। একফালি ছাদের ঘরে কয়েকটা বই আর একটা স্টোভ নিয়ে জীবন কাটানোর দম আমারও তো ছিল না। এখন বুঝি। তাই, নো রিগ্রেটস।"

"সত্যিই কি নো রিগ্রেটস ঋত্বিক?"

"নাহ্, একটা আছে।"

"কী?"

"সেদিন পকেটে পয়সা থাকলে ছবিকাকুর বইগুলো কিনে নিতাম।"

১৩

প্যারিস, ফ্রান্স, ৩১ মার্চ, ১৮৮৯

এই দিনটায়, বিশেষত এই একটি দিনে রাস্তায় বেরিয়ে পড়ার একটা পরিকল্পনা অবশ্য ছিলই থিও-র। সেইমতো আজকের দিনে তিনি কোনও কাজও রাখেননি বটে। আর জো-কে দিন তিনেক আগে থাকতেই বলে রেখেছিলেন, যাতে তিনি বাড়ির কাজ মিটিয়ে নিতে পারেন আগেভাগে। এমনিতে আজ প্রায় বছরখানেক হল, জনা দুয়েক পরিচারিকা রাখার ব্যবস্থা করতে পেরেছেন থিও। জো-র শরীরটা ভাল যায় না, তার উপর ছেলেটা এই বয়সেই যা দস্যি হয়ে উঠেছে! তার হাতের কাছে একটি জিনিসও রাখার উপায় নেই। গত সপ্তাহেই সে একটি যথেষ্ট দামি ও দুর্লভ ভাস ভেঙে ফেলেছে, যা কিনা চিনদেশে তৈরি। প্রথম-প্রথম বাড়ি ফিরে বেশ রাগই হয়েছিল থিও-র। কিন্তু দস্যি ছেলেকে বকুনি দিতে গিয়ে তার হাসিখানা দেখে তাকে জড়িয়ে ধরেছিলেন তিনি। এ এক আজব প্রশান্তি, ভেবে অবাকই লাগে থিও-র। বছরখানেক আগেও এই খুদে মানুষটি তাঁদের পৃথিবীতে ছিল না। আর আজ তাকে জড়িয়ে ধরেই সবচেয়ে বেশি শান্তি পাওয়া যায়। এ রহস্যের সমাধান করতে পারেন না তিনি। তবে বুঝতে পারেন, এই এক গন্ধ আর নিশ্চুপ শান্তির চাদর তিনি আর একজনের শরীর জড়িয়েও পেতেন বটে। তাঁরই দাদা, ভিনসেন্ট।

খুব ছোটবেলায়, বাবার ভয়ে যখন ভাই-বোনেরা এক বিছানায় গুটিসুটি হয়ে শুয়ে পড়ত, তখন খুদে ভিনসেন্টকে জড়িয়ে ধরে থাকত আরও খুদে থিও। তাদের হাতে তখনও লেগে আছে রুটির তপ্ত সুগন্ধ, যা নাকি তারা একটু আগেই খেয়েছে সুপে ডুবিয়ে। দূরে শেয়াল ডাকছে কোথাও একটা, আর সেই ডাক শুনে ভয় পাচ্ছে থিও। সে জড়িয়ে ধরছে দাদা ভিনসেন্টকে, যার চোখ তখনও খোলা, আর তাক করা সটান ছাদের দিকে।

"কী দেখছ ভিনসেন্ট?"

"আকাশ।"

"ও মা, আকাশ কোথায়? এটা তো ছাদ।"

"ছাদের পরেই তো আকাশ, তাই না থিও? তাকিয়ে থাকো, দেখতে পাবে।"

"আর শেয়ালটা? ওই শেয়ালটা বাড়ি অবধি চলে আসবে না তো?"

"যদি বা আসেই, আমি জানি, একটা রুটি আজ বেঁচে গিয়েছে। সেইটা ওকে দিয়ে দেওয়া যাবে।"

ছেলেকে বুকে জড়িয়ে ধরে ঘুমোনোর সময়ে ইদানীং সেইসব শান্ত শীতের রাতগুলোর কথাই ভেবে ফেলেন থিও। তিনি আজও ছাদের দিকে তাকান। কিন্তু ওই ছাদের দিকেই। তার পরের আকাশটা তিনি এই এত বয়সেও একদিনের জন্য দেখতে পান না।

আজ, শীতের শেষের এই চমৎকার রোদ ঝলমলে দিনে অবশ্য রাস্তায় বেরিয়েছেন তাঁরা দু'জনেই। থিও আর জো। ছেলেকে বাড়িতে রেখে আসাই হয়েছে বিচক্ষণের কাজ, নইলে এই ভিড়ভাট্টার সরগরম রাস্তায় তাকে নিয়ে পড়তে হত আর এক ঝামেলায়। আজ সামান্য হালকা আর ঠান্ডা একটা হাওয়া চলছে, নিঃসন্দেহে উত্তরের দিক থেকেই। এমন হাওয়ায় অবশ্য ছুটির দিন কাটাতে ভারী ভালবাসেন প্যারিসের বাসিন্দারা। কারণ শীতের দীর্ঘ বরফমোড়া দিনগুলোর পর এমন নাতিশীতোষ্ণ দিন তাঁদের কাছে দেবদূতের ডানার চাইতে কম কিছু নয়। একটি গাউনের উপর আজ স্কার্ফ চাপিয়ে নিয়েছেন জো, নইলে ঠান্ডা লেগে বিপত্তি ঘটতে পারে। সেইসঙ্গে পরেছেন একটি বাহারি টুপি, যা থিও তাঁকে কিনে এনে দিয়েছিলেন গতবছর। ভারী মিষ্টি দেখাচ্ছে জো-কে, আড়চোখে একবার তাকিয়ে ভাবলেন থিও। তিনিও আজ টুপি নিয়েছেন একটা। শহরের মস্ত বড় আনন্দের দিন বলে কথা, নিজেদের একটু ভাল না দেখালে চলবে কী করে?

"আজ কি গাড়ি ডাকবে একটা?"

থিও জানেন, জো বেশিক্ষণ হাঁটতে পারেন না। কিন্তু আজকের দিনটা গাড়ি চড়ে ঘোরার নয় মোটেই।

"শোনো, তুমি চিন্তা কোরো না, আমরা না হয় মাঝে-মধ্যে দাঁড়িয়ে একটু জিরিয়ে নেব। কিন্তু আজ না হাঁটলে মজাটা বুঝতে পারবে না।"

শুরু হল হাঁটা। একবার দু'চোখ তুলে উপরের দিকে তাকালেন থিও আর জো। প্যারিস আজ পৃথিবীর সেরা রূপসির মতোই সেজে উঠেছে। প্রায় প্রত্যেক বাড়ির সবক'টা জানলা থেকে ঝুলছে ফ্রান্সের জাতীয় পতাকা, উড়ছে লাল, নীল আর সাদা বেলুন, সেইসঙ্গে কাগজের ঝিরিঝিরি টুকরো। আকাশ কদাচিৎ চোখে পড়ছে, এমন অবস্থা। কার্নিভাল। হাঁটতে হচ্ছে কোনওক্রমে কারণ মানুষের সংখ্যা গোনা যাচ্ছে না কোনও রাস্তাতেই। যেমন আছেন শহরের নামজাদারা, তেমনই সাধারণ মানুষ। অবশ্য তেমন-তেমন নামী লোকজন আজকের দিনে ঘোড়ার গাড়ি ছাড়া বেরোননি মোটেই। সকলেই আজ পরে বেরিয়েছে যার-যার সেরা পোশাকখানা, যাতে তাকে আরও-আরও সুন্দর দেখাতে পারে। হাতে-হাতে কাগজের বাঁশি নিয়েছেন কেউ-কেউ, ফুঁ দিয়ে বাজিয়েই চলেছেন সেসব। সেইসঙ্গে রাস্তার

মোড়ে-মোড়ে লোকজন দল বেঁধে আনন্দ আর ভালবাসার গানগুলো গেয়ে চলেছে। হ্যাঁ, কার্নিভালই বটে আজ!

বাড়ি থেকে বেরিয়ে ডানদিকের রাস্তাটা ধরেই থিও আর জো বুঝলেন, ভুল কিছু করেননি। মানুষের ঢল চলেছে তাঁদের ঠিক বিপরীত দিকে, যেখানে আজ পৃথিবীর সবচাইতে বড় জমায়েত। না, সেখানে হাজির হয়ে শরীরকে মোটেই কষ্ট দিতে চান না থিও, তা ছাড়া তিনি ভালই জানেন, জো-রও ধাক্কাধাক্কি ভিড় পছন্দ নয় একেবারেই। তাঁরা কেবল বেরিয়েছেন একসঙ্গে একটা ভাল দিন কাটাবেন বলে, যেদিন শহরের পথে-পথে উৎসবের আমেজ, অথচ চাইলে তার থেকে একটু দূরে বসে আনন্দের আঁচ পোহানো যায়। শঁজেলিজে যাওয়ার কোনও মানেই হয় না, সেখানে জনস্রোত আরও জমজমাটই হওয়ার কথা, বরং হেঁটে-হেঁটে মমার্ত যাওয়া যেতে পারে। একটু বেশিই হয়তো হাঁটা পথ, কিন্তু এমন আবহাওয়ায় মন্দ লাগবে না হাঁটতে। তেমন হলে পথে ভাল দেখে একখানা ক্যাফেতে এক পেয়ালা করে কফি হয়ে যেতে পারে। মমার্তের দিকটায় আজ লোকজনের আনাগোনা বেশ কমই থাকবে, এ কথা হলফ করে বলতে পারেন থিও। বরং সেখানে বসেই সামান্য কিছু খাবার ও পানীয় সহযোগে দু'জনে গল্প করা যেতে পারে আজ। কাজের চাপে জো-র সঙ্গে কতদিন ভাল করে আড্ডাই দেওয়া হয়নি থিও-র।

আসলে এত সেজেগুজে তৈরি হয়ে হইহই করতে-করতে আজ সকলেই চলেছে শঁ-দে-মার্স-এর বিশাল চত্বরের দিকে। সেখানে আজ দেখার মতো একটা ব্যাপার হচ্ছে বই কী। ফরাসি বিপ্লবের একশো বছর উপলক্ষে ওয়ার্ল্ড ফেস্টিভ্যালের আয়োজন হয়েছে। সারা পৃথিবী থেকে আজ বহু মানুষ হাজির হয়েছেন ফ্রান্সের এই শহরে, ইতিহাসের সাক্ষী থাকতে। অবশ্য সেইসঙ্গে আরও একটি ঘটনার তাঁরা সাক্ষী থাকছেন। এই একশো বছর পূর্তিকে মাথায় রেখেই শঁ-দে-মার্স-এর খোলা চত্বরে তৈরি করা হয়েছে এক বিশাল মিনার, টাওয়ার আইফেল। সে এক ভারী অদ্ভুত মিনার বটে। তৈরি হচ্ছিল বছর কয়েক ধরে, যাতায়াতের পথে বেশ অবাক হয়েই তাকিয়ে থাকতেন থিও। মনে হত, প্যারিসের চেহারাটাই বুঝি পালটে যাচ্ছে। যে-প্যারিসে তিনি থাকেন, সেই প্যারিস অন্যরকম হয়ে যাবে না তো? ভয়ও হত এ কথা ভেবে। কিন্তু তৈরি হওয়ার সময়েই এর কারিগরির তারিফ না করে পারেননি থিও। হ্যাঁ, দেখার মতো একখানা মিনার বানিয়েছে বটে। সেই আইফেলেরই আজ উদ্বোধন। প্যারিসের প্রত্যেক নামজাদা লোক তো সেখানে আমন্ত্রিতই, সাধারণ মানুষের ভিড়ে সেই ভোর থেকেই উপচে পড়ছে আইফেলের পাদদেশ।

সেদিকে তাই আজ যাওয়া নেই। তাঁরা প্যারিসেরই বাসিন্দা, টাওয়ার আইফেল না হয় সামনের হপ্তাতেই দেখে আসা যাবে। তবে হ্যাঁ, নিজের শহরটার জন্য মনে-মনে চাপা গর্ব

করতে ভুললেন না থিও।

সেন্ট পিটার্স ব্যাসিলিকার উঁচু চত্বরটার গুণ এই যে, এখান থেকে নীচে তাকালে গোটা প্যারিস এক ঝলকে দেখা যায়। এটা থিও আর জো-র ভারী পছন্দের একটি দৃশ্য। দুপুরটা মাঠের সবুজ ঘাসে ক্লান্ত পিঠ ঠেকিয়ে সেখানেই কাটালেন তাঁরা। দূরে আর নীচে তখন দেখা যাচ্ছে প্যারিসের অর্ধেকেরও বেশি বিস্তার, যা চোখকে শান্ত করে দেওয়ার পক্ষে যথেষ্ট। সাদা পাথরের রেলিং-এ হাত রেখে অনেকক্ষণ সেই দূরবর্তী বিস্তৃতির দিকে তাকিয়ে থাকলেন জো আর ঘাসে শুয়ে থিও পড়ে নিচ্ছিলেন প্রিয় বইগুলির একটি। ব্যস্ত থিও-র জীবনে এখন এমন দুপুর বেশ বিরলই হয়ে উঠেছে।

"একটা কথা জিগ্যেস করব, থিও?"

বরের পাশে এসে ঘাসে পিঠ ঠেকিয়ে শুলেন জো। তাঁর টুপির জাফরি রোদ ছেঁকে নিয়ে মুখের উপর ফেলছে, যা আইফেলের চেয়ে কম বিস্ময়কর কিছু নয় থিও-র কাছে। বইটা নামিয়ে বুকের উপর রাখলেন থিও।

"অবশ্যই। বলো..."

"ভিনসেন্ট বোধহয় আমাকে একেবারেই পছন্দ করে না, তা-ই না?"

"সে কী! এ কথা কেন মনে হল তোমার? নিশ্চয়ই সে পছন্দ করে তোমাকে। চিঠিতে বারবার খোঁজ নেয় তোমার স্বাস্থ্য ঠিকঠাক আছে কিনা। তুমি তো জানো।"

"হ্যাঁ, তা নেয়। কিন্তু আমার কী মনে হয় জানো, আমাদের বিয়েটা ভিনসেন্ট মোটেই ভাল চোখে দেখে না। সত্যি বলতে কী, বিয়েটা হোক, এটা সে চায়নি।"

"এসব কী বলছ জো? এমন সব ভুল ধারণা কোত্থেকে হল তোমার?"

"আমি কিন্তু কোনও খারাপ লাগা বা অভিমান থেকে বলছি না থিও। শুধু সত্যিটা জানতে চাইছি। সেটুকু তুমি নিশ্চয়ই লুকোবে না?"

"কিছুই লুকোচ্ছি না আমি তোমার কাছে। সে ভারী খুশি আমাদের এই নতুন জীবনে।"

"তা হলে ডিসেম্বরে ওই দুর্ঘটনা ঘটাত কি, বলো? কতখানি আঘাত পেলে, রেগে গেলে, কষ্ট পেলে একজন মানুষ নিজের কান কেটে ফেলতে পারে থিও? আন্দাজ করতে পারো তুমি?"

"কী মুশকিল! সেই ঘটনার সঙ্গে আমাদের বিয়ের কী যোগাযোগ?"

"আছে থিও। তোমাকে পাঠানো চিঠিগুলি ভাল করে পড়ে দেখলেই যোগাযোগটা পাবে। ভিনসেন্ট কখনওই চায়নি, তোমার জীবনে নতুন কেউ আসুক। তোমাকে সে প্রাণের চাইতেও বেশি ভালবাসে থিও। আর ভালবাসার চাইতেও বেশি নির্ভর করে তোমার

উপরে। ওর পরিবার বলতে তো তুমিই একা। তুমি ওর ভাই, ওর বন্ধু, ওর সমঝদার, ওর একমাত্র পৃষ্ঠপোষক তুমিই। তুমি একা থাকলে ভিনসেন্টকে সাহায্য করে যাওয়া কঠিন কিছু নয়। কিন্তু তোমার পরিবার তৈরি হলে? তখন তোমার রোজগার ভাগ হয়ে যাবে অনেক বেশি। আরও বেশি করে ভাগ হয়ে যাবে তোমার ভালবাসা। একা হয়ে যাবে ভিনসেন্ট। এমনটাই ভেবেছে সে। ভেবেছে, আর কষ্ট পেয়েছে। তোমাকে দূরে সরে যেতে দেখে রাগে-দুঃখে-কষ্টে নিজের শরীরের উপর অত্যাচার করেছে। এমনটাই আমার বিশ্বাস।"

"জো, আমার রূপসি প্রিয়তমা, তুমি সম্পূর্ণ ভুল বুঝছ ভিনসেন্টকে। সে নিজের আঁকা ছাড়া আর কিচ্ছু বোঝে না। হ্যাঁ, কষ্ট পেত। কষ্ট সে পেত, যদি আমাদের বিয়ের পর আমি আর তার সঙ্গে যোগাযোগ না রাখতাম, নিয়মিত তাকে টাকা না পাঠাতাম। কিন্তু এসব তো আমি থামিয়ে দিইনি জো! আর থামিয়ে যে দিইনি, তার জন্য তোমার কাছেও আমি ঋণী। আর কেউ না জানুক, আমি তো জানি, ভিনসেন্ট আর তার শিল্পকে কতখানি ভালোবাসো তুমি! তাই এসব চিন্তা মনেও এনো না লক্ষ্মীটি। কেমন?"

"তা হলে এত জায়গা থাকতে ভিনসেন্ট নিজে গিয়ে অ্যাসাইলামে ভরতি হল কেন, বলো? সে কি একটিবার জানাতেও পারত না তোমাকে? যাকে নাকি সে সমস্ত খুঁটিনাটি চিঠিতে লিখে জানায়? আমাদের বাড়ি তো ছিল। হয়তো আমি না থাকলে তুমি তাকে সেখানে এনে রাখতে পারতে। তাই না থিও?"

"একেবারেই তা নয় জো। আমি বরং খুশি যে ভিনসেন্ট নিজে থেকে এই সিদ্ধান্তে পৌঁছোতে পেরেছে। এটা খুব জরুরি ছিল ওর জন্য। ওর পাগলামিকে সারিয়ে তোলার একটা ইচ্ছে যে ওর নিজের মধ্যেই এসেছে, এটা দেখেই খুশি আমি। না-ই বা জানাল আমায়। থাক না ক'টা দিন। চিকিৎসা হবে ওখানে, শান্তি পাবে ভিনসেন্ট। তারপর না হয় একবার নিয়ে আসা যাবে তাকে প্যারিসে।"

"কে জানে! আমার এত সোজা মনে হয় না সব কিছু। দ্যাখো থিও, আমি সৌভাগ্যবান যে তোমাদের পরিবারে বিয়ে করে এসেছি, ভিনসেন্টকে দেখতে পেয়েছি কাছ থেকে। কিন্তু আমি কখনওই তোমাদের ভালবাসায় ভাগ বসাতে চাই না। আজ বলি, যদি কোনও দিন ভিনসেন্ট আর আমার মধ্যে কাউকে বেছে নিতে হয়, আমাকে ত্যাগ করতে এক মুহূর্তও দ্বিধা কোরো না।"

উপরে তাকালে এখন প্যারিসের বিকেলের আকাশ। সেটাই ছাদ। পাশে শুয়ে থাকা জো-র ডান হাতের পাতাটা হাতের মুঠোয় তুলে এনে নিঃশব্দে চুম্বন করলেন থিও।

বাতাস ঠান্ডা হয়ে এসেছে, আর একটু পরেই সন্ধে নেমে যাবে। আজ শহরের পথে-পথে অনেক বেশি বাহারি আলোর ব্যবস্থা করা হয়েছে, ভোররাত অবধি খোলা থাকবে

পানশালাগুলো। সেসবের আগেই অবশ্য বাড়ি ফিরে যেতে চান থিও। ছেলেটাকে না দেখে আজকাল বেশিক্ষণ থাকতে পারেন না তিনি।

থিও ঠিক যেমনটা ভেবেছিলেন, মমার্ত আজ বেশ ফাঁকাই। অন্য দিন এতক্ষণে ক্যাফে আর রেস্তোরাঁগুলো জমজমাট হয়ে ওঠে, বেশ দূর থেকেই শোনা যায় হইহল্লা আর গানবাজনা। রাস্তায় দাঁড়িয়ে আধ ঘণ্টায় ছবি এঁকে ফেলা শিল্পীদের সঙ্গে খদ্দেরদের আড্ডা আর দরদাম চলতে থাকে। আজ সেসব প্রায় নেই। এখানকার রোজকার লোকজনও আজ আইফেল টাওয়ারের নীচে জড়ো হয়েছেন।

"এদিকে এলে যে? বাড়ি ফিরবে না?"

"ফিরব জো, একটু ঘুরে গেলে কি খুব অসুবিধে হবে তোমার? নীচে নেমে বরং একটা গাড়ি ডেকে নেওয়া যাবে'খন। আপাতত চলো না, এই ডানদিকের রাস্তাটা ধরে নেমে যাই। যাবে?"

মাথা নেড়ে সম্মতি জানালেন জো, তাঁর মুখে সামান্য হাসি। মমার্ত থেকে ডান হাতের এই রাস্তাখানা এঁকে-বেঁকে, বাড়ি আর দোকানের পাশ কাটিয়ে পৌঁছে গিয়েছে নীচে, বড় রাস্তায়। বিশেষত সন্ধে হয়ে আসা এই সময়ে এখানে হাঁটতে মন্দ লাগে না। লোকজন এখন দিব্যি কম, সেইসঙ্গে ভেসে আসছে ঝাপসা হইচই। প্যারিস, প্রিয় প্যারিস যেন দূরের কোনও শহর এখানে।

মমার্ত থেকে ডাইনে বেঁকে আবার বাঁ-দিক নিতেই শুরু হল সরু একখানা রাস্তা, রু লেপিক। সেইটে ধরেই হেঁটে যাওয়া এখন। রাস্তা নামছে, সন্ধে নামছে, জো আর থিও নামছেন। হঠাৎ বাঁ হাতের একখানা চারতলা বাড়ির সামনে এসে হাঁটা থামালেন থিও। জো অবশ্য জানতেনই যে এমনটা হবে। তাই তাঁর ঠোঁটের ডগায় সামান্য হাসি। রু লেপিক-এর ৫৪ নম্বর বাড়ির সামনে দাঁড়িয়ে আছেন থিও, পাশে জো। মুখ তুলে থিও দেখছেন চারতলার সেই জানলাটির দিকে, যার ওপাশের ঘরটিতে টানা দু'বছর ভিনসেন্টকে নিয়ে থেকেছেন তিনি। জো-র সঙ্গে বিয়ে হবার আগে পর্যন্ত। ঝগড়া হয়েছে, তর্ক হয়েছে, কিন্তু তিনি ছায়ার মতো থেকেছেন ভিনসেন্টের সঙ্গে।

বাড়িটার সামনে মিনিটখানেক দাঁড়িয়ে থেকে উদাসীন হাঁটতে থাকলেন থিও। জো-কে পিছনে ফেলে একাই এগিয়ে গেলেন । জো আলতো পায়ে অনুসরণ করলেন থিওকে। আর এই সন্ধের নিভে আসা আলোয় স্পষ্ট দেখতে পেলেন, দুই অভিন্নহৃদয় প্রেমিকের মাঝখানে এসে দাঁড়িয়েছেন তিনি। যেখানে তাঁর আসার কথা ছিল না কোনও দিন।

১৪

প্যাথোলজি অ্যান্ড মোর, থিয়েটার রোড, কলকাতা
নভেম্বর, ২০১৭

তোমার রক্তের মধ্যে যে ঘুরে বেড়াচ্ছ না তুমি নিজেই,
এ কথা হলপ করে কে বলতে পারে?
কে বলতে পারে সুস্বাদু রুটিদের মধ্যে লুকিয়ে নেই
কোনও মিঠে ষড়যন্ত্র?
কে তোমাকে কথা দেবে যে ওই অপেরা সিঙ্গার
আসলে ডাকাতদের সঙ্গিনী না, যার জন্যে তুমি উন্মাদ?
এই সরাইখানায়, তুমি অতিথিমাত্র হে বালক।
এখানে হেমন্তকাল কিনে আনা হতে পারে চাইলেই,
বলে দিলেই পাওয়া যেতে পারে মনমতো বিছানা ও পানীয়
এমনকী আগে থাকতে অর্ডার দিলে
বনভোজনের নিরপরাধ দৃশ্যও।
কিন্তু হে সরল অতিশয়,
তোমার তেমন-তেমন দিনগুলো এখানে খুঁজতে এসো না কখনও।

ঋত্বিকের হাতটা, এই এক্ষুনি, শুয়ে আছে বিছানার উপর। সে একটা নীল-সাদা স্ট্রাইপ্‌ড শার্ট পরেছে, একই রঙের স্লিভ গুটিয়ে রেখেছে প্রায় কনুই অবধি। আর তাই, এখন, এই বিছানার উপর, তার ফর্সা হাতখানার কবজি ও তার পরের দিককার শিরা-উপশিরা দেখা যাচ্ছে। নীচের চাদরখানা, যার উপর সে চুপচাপ শুয়ে আছে, এক্কেবারে সাদা হওয়াতে তার হাতের নরম আভা আরও বেশি করে ফুটে উঠছে যেন।

হাতের পাতা যেখানে শেষ হচ্ছে, ঠিক তার নীচে একটা ছোট্ট তিল। কালো নয় তেমন, বাদামি বলা যেতে পারে। আর তার কিছু দূরেই সেই বিখ্যাত শিরা, আত্মহত্যা যার বন্ধু, ব্লেড যার সখা। এই তিল নামক বিন্দুটির পাশে দাঁড়িয়ে দেখলে, শিরাখানা বেশ উজ্জ্বল

আর স্বাস্থ্যবান বটে। কবজির একেবারে গোড়া থেকে বইতে শুরু করে সে উঠে গিয়েছে হাত বেয়ে, উপরের দিকে। শুধু যে উঠেই গিয়েছে তা নয়, একের পর এক রাস্তা তার মধ্যে থেকে বেরিয়ে এসেছে। কেউ উঁচু, স্পষ্ট। কেউ বা সমতল, কিছু আবছা। কিন্তু প্রত্যেকেই, নিয়মমাফিক, নীলচে সবুজ। যেন আর কোনও রঙে তাদের বয়ে যাওয়ার কথাই ছিল না।

তিলের একটু নীচে, ঠিক যেখান পর্যন্ত আত্মহত্যার কারণে বিখ্যাত শিরাটি একলা হয়ে আছে, সেখান থেকে শুরু হয়েছে সরু আর কালচে বাদামি ছোট-ছোট লোম। নদীর পাশে ঘাস যেরকম থাকে, যেমন ব্যস্ত রাস্তার পাশে মানুষের সারি থাকে। তারাও উঠে গিয়েছে অনেকখানি, ঢুকে গিয়েছে সাদা-নীল স্ট্রাইপ্‌ড শার্টের গুটিয়ে রাখা হাতের ওদিকে। কিন্তু শুয়ে-শুয়ে ঘাড় ঘুরিয়ে যে-অংশটা এখন ঋত্বিক দেখতে পাচ্ছে, সেখানে, ওই বাদামি ছোট্ট তিলের কাছটায়, আসলে একটা জটলা। যার সময় সন্ধে ছ'টা, স্থানাঙ্ক হাজরার মোড় এবং সাল ২০০৩।

কলেজ শেষ হয়েছে একটু আগে, সুতীর্থ-শ্যামলীরা বাড়ি ফিরে গিয়েছে দু'-এক দফা আড্ডার পর। ঋত্বিক জানে তার এখন কী করণীয়। আর জানে বলেই এই শীত-শীত বর্ষাকালেও ঘামছে সে একটু-একটু। এখন তার একটা অটো ধরার কথা, ধরে সোজা চলে যাওয়ার কথা সুদক্ষিণাদের বাড়িতে। কথা মানে, সে নিজেকেই এই কথা বলে বুঝিয়েছে যে, এবার একবার তার যাওয়া দরকার বই কী। সুদক্ষিণা দিন তিনেক কলেজ আসছে না, জ্বর হয়েছে। তার কপাল গরম হয়ে গেলে ছুঁতে ঠিক কীরকম হবে, যেন এইটাই একবার তার দেখে আসা দরকার, নিজেকে এমনটাই বুঝিয়েছে সে। জ্বরের সময়ে শত্রুর কপালেও হাত রাখা যায়। সুতরাং সুদক্ষিণা নিশ্চয়ই আপত্তি করবে না? উত্তরটা হ্যাঁ, নাকি না, এইটা ভেবেই ঘেমে উঠছিল রোগা চেহারার ঋত্বিক।

বৃষ্টি হয়েছে সারা দুপুর, এদিক-ওদিক জলে স্ট্রিট লাইট আর ট্রামের তারের ছায়া পড়ে আছে এখনও। যে-জটলাটা আসলে ওই বাদামি তিল, তার শুরু হতে দেরি আছে। সে আরও পরে আসবে এই সন্ধেয়। আপাতত একটা অটোর পিছনদিকের ধারের সিট পেয়ে গেল ঋত্বিক।

তার পকেটে একটি চিঠি। ব্যাগেই রাখতে পারত, কিন্তু অনেক সময়ে বন্ধুরা ব্যাগ-ট্যাগ খুলেও এমন হুজ্জোত লাগায় যে সেই ভরসা সে পায়নি। তাই চার ভাঁজ করে পকেটেই রাখা। প্রথমবার লিখেছে এবং যা বলার সব বলেও দিয়েছে সুদক্ষিণাকে। এই যে তার মনে হচ্ছে, সকালে ঘুম থেকে উঠে সামনে এবং সবচাইতে আগে সে সুদক্ষিণার ওই আশ্চর্য মুখখানাই দেখতে চায়, এর চাইতে সহজ কথা পৃথিবীতে আর কী আছে? এটুকু সুদক্ষিণা ঠিকই বুঝবে। আর ঋত্বিকের ধারণা, সুদক্ষিণা তা জানেও। তাদের দু'জনেরই আর্ট কলেজে

ফার্স্ট ইয়ার চলছে, আরও দু'বছর অন্তত রোজ দু'জনের দেখা হবেই। কিন্তু তারপরও যাতে দেখা হওয়াটা বন্ধ না হয়ে বরং নিয়মেই বদলে যায়, সেই চেষ্টার প্রথম ভাগটা আজই ঋত্বিক সেরে ফেলতে চায়। সে জানে এটা নেহাত ছেলেমানুষিই হবে। তেমন-তেমন পছন্দের মানুষকে না পেলে কারও জীবন নষ্ট হয়ে যায় না মোটেই। কত ছেলে-মেয়েরই তো এমন হয়। কিন্তু এত জেনেবুঝেও এই যে বারবার মনে হওয়া, ওই মানুষটিকে কাছে না পেলে এই জীবনের কোনও মানেই নেই, এই মনে হওয়াটাই এখন ভারী মজার লাগছে ঋত্বিকের।

চিঠির শুরুতেই সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়ের একটা কবিতা থেকে গোটা চারেক লাইন... তার ভারী পছন্দের... টুকে, মানে উদ্ধৃতি করে দিয়েছে সে। তারপর নিজের বিচ্ছিরি হাতের লেখায় বড়জোর লাইন দশেক। মনের কথা বলতে এর চেয়ে বেশি সে মোটেই লিখতে চায়নি। এখন কাজ হচ্ছে, ঠান্ডা মাথায়, গরম কপালে, চিঠিটা রেখে দিয়ে আসা।

"তুই কি সিরিয়াসলি পাগল? এই বৃষ্টির মধ্যে এতদূর এলি কেন?"

নিজের ছোট ঘরের একধারে বিছানায় শুয়ে আছে সুদক্ষিণা। জ্বর তার মতো ঝলমলে মেয়েকেও যথেষ্ট কাবু করেছে এই কয়েকদিনে। ঘরের পাখা বন্ধ, একটা জানলার একটা পাল্লা কেবল খোলা। তার ওদিক থেকে হাওয়া এসে মিকি মাউজের মুখ-ছাপা পরদাকে দুলিয়ে যাচ্ছে বারবার। আজকের হাওয়া বেশ ঠান্ডাই বলতে হয়। সুদক্ষিণার গলা অবধি চাদরে ঢাকা, যার অন্য প্রান্ত থেকে পায়ের দু'খানা পাতা বেরিয়ে আছে। জ্বর বলেই বোধহয় আরও যত্ন করে তার চুল বেঁধে দুটো বিনুনি করে দিয়েছেন মাসিমা, তাকে নেহাত ছোট্ট একটি কাহিল মেয়ের মতোই দেখাচ্ছে।

"তিন দিন আসছিস না, জ্বর হয়েছে... একবার দেখতে আসব না?"

"আরে ধুস, সেদিন বৃষ্টি ভিজলাম না... ব্যস! আমার একদম সহ্য হয় না। কিন্তু আমি তো সামনের সপ্তাহেই আবার যেতাম। তুই খামোকা আসতে গেলি কেন?"

"খামোকা কেন হবে? দেখতে এলাম তোকে।"

"বোঝো ছেলের কথা। কেউ জানলে যা আওয়াজ খাবি না..."

"সে দিক গে আওয়াজ, আমার কিছু যায় আসে না। কত জ্বর দেখি..."

এই মুহূর্তটা অনেকগুলি মিনিট দিয়ে তৈরি বলে মনে হল ঋত্বিকের। আর যতখানি কঠিন ভেবেছিল, বুঝতে পারল, তার চাইতে অনেক মসৃণ। তার ডান হাত, হাতা প্রায় কনুই অবধি গোটানো, আস্তে-আস্তে পকেট থেকে বেরিয়ে যেতে শুরু করল সুদক্ষিণার কপালের দিকে। সেখানে চুলগুলো টানটান করে বেঁধে রাখায় বেশ চৌকোনো একখানা জায়গা তৈরি হয়েছে, সেই জায়গাই বলে দিচ্ছে জ্বরের কম-বেশি। বাইরে, সুদক্ষিণাদের

বাড়ির সামনের ছোট, এক-ল্যাম্প-পোস্টওলা রাস্তায় কেউ একজন ঘটিগরম হাঁকতে-হাঁকতে যাচ্ছেন, যিনি নিশ্চয়ই রোজ যান এ সময়ে। একটা সাইকেল অন্য দিক থেকে এসে বেল বাজাতে-বাজাতে ভেসে যাচ্ছে আর একদিকে। কাদের বাড়িতে টিভি চলছে। তাতে খবর পড়ছেন ভারী কণ্ঠের কোনও পুরুষ। প্রতিরক্ষামন্ত্রীর বিশেষ বৈঠকে কী হয়েছে, সেই বিষয়ে দু'লাইন হওয়ার পরই শোনা গেল, 'এবার খেলার খবর'। হাওয়া দিল আরেকবার, মিকি মাউজের হাসিমুখ ঢুকে এল সুদক্ষিণার ঘরের ভিতর।

ঋত্বিক নিজেই দেখতে পেল, তার ডান হাতটা ভাসতে-ভাসতে পৌঁছোল সুদক্ষিণার কপালে, যা নাকি বহু-বহু দূর ছিল এই গোটা একটি বছর ধরে। একটি হাতের এক বছর সময় লাগে কপালে পৌঁছোতে। সাধারণ অঙ্ক। সেইমতো আজ নিজের হাতকে পৌঁছোতে দেখল সে। মহাকাশযান যেভাবে অন্য গ্রহের মাটিতে নামে, সেভাবেই নেমে এল তার হাত। হাতের পাতা। পাঁচটা আঙুল। ধীরে। নেমে এসে আলতো করে ছুঁয়ে থাকল সুদক্ষিণার কপাল। যা এই মুহূর্তে বেশ গরম। কত হবে? ১০১? কপালের অনেক নীচ থেকে ভাপ উঠে এসে লাগছে ঋত্বিকের হাতের পাতায়। জ্বরের ভাপ। মাটির নীচের উত্তাপ। অন্য গ্রহের উষ্ণতা।

"হুম, ভালই তো বাধিয়েছিস দেখছি।"

"ভাগ্যিস বাধিয়েছিলাম, তাই দেখতে এলি। নাহলে তো পাত্তাও দিস না।"

"এটা তুই বলতে পারলি? ইন ফ্যাক্ট, তোকে এতজন পাত্তা দেয় বলে আমার পাত্তাটা বুঝতে পারিস না।"

"ন্যাকামি করিস না। শিঙাড়া খাবি? মোড়ের দোকানটায় দারুণ ভাজে। আরতিদি আছে এখনও, বলি আনতে?"

"না না, এখন আর ওসব ঝামেলা করিস না। আমি বসব না বেশিক্ষণ। শোন না, একটা কথা ছিল তোর সঙ্গে। যদিও তোর শরীর ভাল না এখন..."

"ধ্যাত! তখন থেকে শরীর ভাল না ভাল না করছিস... তোর নিজের কোনও দিন জ্বর হয়নি? বল না, কী বলবি বলছিলি..."

ঋত্বিক আবারও দেখল, তার ডান হাত, যা নাকি কপাল থেকে তার ডান পকেটেই ফেরত গিয়েছিল, আবার বেরিয়ে আসছে। এবার তার দু' আঙুলে ধরা একখানা চারভাঁজ করা কাগজ। কাগজটা তার চেনা।

"এইটা তোর জন্য এনেছিলাম রে।"

"কী রে এটা?"

"চিঠি। তোকে লেখা। আমার।"

"চিঠি? তোর লেখা? আমাকে?"

"হ্যাঁ।"

"মানে? শুধু-শুধু আমাকে চিঠি লিখতে গেলি কেন?"

"শুধু-শুধু না রে। মানে..."

"ঋত্বিক? তুই...? কী রে? অ্যাই, এদিকে তাকা?"

ঋত্বিক কথাগুলি বলছিল বিছানার চাদরের দিকে তাকিয়ে। সুদক্ষিণার ডাকার ধরন শুনেই বুঝল, সে বুঝে গিয়েছে। আর এ-ও বুঝল, সুদক্ষিণা এবার বয়সে বড় দিদির মতো ব্যবহার করবে। তার গলার স্বর তেমনটাই আন্দাজ পাঠাচ্ছে। তবু সে তাকাল। আর তাকিয়ে দেখল, সুদক্ষিণা মিথ্যে-মিথ্যে নয়, সত্যি-সত্যি অবাক হয়ে তার দিকে তাকিয়ে আছে।

"কী রে তুই? মানে... সিরিয়াসলি? হ্যাঁ? আগে কখনও বলিসনি কেন?"

"এই তো আজ বলতে এলাম। সময় লাগে তো, নাকি..."

"আমি জাস্ট... মানে আমি..."

"বিশ্বাস করতে পারছিস না, তাই তো?"

"তা নয়। আসলে... ফ্র্যাঙ্কলি, আমি না, এটা তোর থেকে আশাই করিনি। বিলিভ মি।"

"সে আমি তোকে না জানালে তুই আশা করবি কী করে?"

"তা নয়, মানে, একটা তো আন্দাজ থাকে। আমি কখনও গেস করিনি রে। ইসস..."

"আরে ইসস বলবার কী হল? এই নে, রাখ।"

"না রে, চিঠিটা দিস না। আমার মনখারাপ হবে। নিশ্চয়ই খুব সুন্দর করে লিখেছিস তুই, আমি শিয়োর। কিন্তু আমি তো ওটার কোনও উত্তর দিতে পারব না, তাই দিস না। প্লিজ় ঋত্বিক..."

বিছানার চাদরটা আবার দেখতে পাচ্ছে ঋত্বিক, কারণ তার মাথা আবারও নেমে এসেছে। হাতে চিঠিটা ধরা, যা এবার তার মুঠোর ভেতর কুঁকড়ে ঢুকে যাচ্ছে আস্তে-আস্তে।

"তুই কখনও জিগ্যেস করিসনি, আমিও বলিনি তাই। কাউকেই বলিনি ইন ফ্যাক্ট। শুধু অমৃতা জানে, কারণ ও স্কুল থেকে আমার বন্ধু। আমি দীপাঞ্জনদাকে ভালবাসি রে। ছোড়দার বন্ধু? আমার জন্মদিনের পার্টিতে হয়তো দেখেওছিস ওকে। তিন বছর হল। কিন্তু আমার খুব খারাপ লাগছে রে। আমরা এত ভাল বন্ধু, অথচ..."

ঋত্বিক যখন হাজরা মোড়ে অটো থেকে নামল, তখন সাড়ে আটটা বাজছে। চিঠিটা সে মাঝপথে পকেট থেকে বের করে ফেলে দিয়েছে। কোনখানে পড়ল, খেয়াল করেনি। তার

মধ্যে এখন যেটা হচ্ছে, সেটাকে ভবিষ্যতে ছেলেমানুষি দুঃখ বলে মনে হতে পারে যদিও বা, এক্ষুনি খুব অসহ্য লাগছে তার। ট্রাম লাইন দুটো কাটাকুটি করে গিয়েছে হাজরার মোড় দিয়েই। দু'পাশে রাস্তা পেরোনোর আলোর জন্যে অপেক্ষা করছেন অফিস ফেরতা লোকজন। এমন সময়ে ঘটল ব্যাপারটা।

২০৫ নম্বর বাসটা মোড় পেরোতে না পেরোতেই এক দল যাত্রী রে-রে করে নেমে এলেন। পুরুষ যাত্রী প্রত্যেকেই। মোড়ের মাঝখানটায় একটা বেশ জটলামতো তৈরি হল মুহূর্তে। জনা বিশ-পঁচিশ যাত্রী তো হবেনই সংখ্যায়। নামার সময় তাঁরা কলার ধরে নামিয়েছেন একটি রোগামতো যুবককে, পকেটমারির অপরাধে। যুবকটি সকলকে ছাড়িয়ে চলে যাওয়ার চেষ্টা করছে, কিন্তু পারছে না। কারণ তার ঘাড়, মাথা, হাত, সব কিছুই কেউ না কেউ ধরে রেখেছেন। তারপর শুরু হল মার। প্রথমে চড়-থাপ্পড়-কিল, তারপর লাথি আর ঘুসি। ঋত্বিক রাস্তার এপার থেকে দেখতে পাচ্ছে পুরোটা। সে পার্কের রেলিং-এ ঠেস দিয়ে দাঁড়িয়ে আছে, আর দেখছে জটলার গতিবিধি। মার চলল, পুলিশ এক-দু'জন এলেন কিন্তু কিছু করে উঠতে পারলেন না। হাত মুচড়ে দেওয়া হল যুবকটির, তার চিৎকার আর মিনতি ভেসে-ভেসে বেড়াচ্ছে বর্ষাকালের হাওয়ায়। চোয়াল বাঁকিয়ে ভেঙে দেওয়া হল। মারের চোটে কপাল আর চোখের পাশ ফুলে গেল যুবকটির। মাটিতে ফেলে তারপর কেবলই লাথি মারা হল কিছুক্ষণ। তার হাঁটুর ছাল উঠে মাংস বেরিয়ে পড়ল এবং মুখ থেকে উঠতে লাগল রক্ত। তার প্রবল চিৎকার তখন গোঙানিতে পরিণত হয়েছে, যার উপর একের পর এক দাঁড়িয়ে পড়ছে যাত্রীদের গালাগালির গুচ্ছ। তারপর, যুবকটির চুলের মুঠি ধরে তার মাটিতে ঘষটে যাওয়া মুখ উপরদিকে তুলে যখন জুতো পরা পা দিয়ে মুখ থেঁতো করে দেওয়ার জন্যে চালানো হচ্ছে একের পর এক লাথি, ঠিক তখনই ঋত্বিকের ভারী ইচ্ছে করল গরম শিঙাড়া খেতে। উলটোদিকের ফুটপাতে বড় মিষ্টির দোকানটাতে এখনও গরম-গরম বিক্রি হয়। সে ওই বেধড়ক জটলার পাশ দিয়ে আনমনে হেঁটে যেতে থাকল সেই দোকানের দিকে।

সময়, কোনও এক বাতাসযানের মতোই, সেই জটলা, সেই হেঁটে যাওয়া ঋত্বিক, সেই ট্র্যাফিক আটকে থাকা হাজরা মোড়, সেই বৃষ্টির কলকাতা থেকে উঠে আসতে লাগল উপরের দিকে। উঠতে থাকল। উঠতেই থাকল। আর এমনভাবে উঠে আসতে থাকল যে নীচের সব কিছু ছোট হতে-হতে আরও ছোট হয়ে এল। এত বছর ধরে সময় ক্রমাগত উঠে আসতে-আসতে সেই উত্তেজিত জটলাটা এখন শান্ত, ছোট্ট, বাদামি একটা তিল। কাটাকুটি করা ট্রাম লাইনদুটো এখন দুটি শিরা, আর দু'দিকের ফুটপাতে দাঁড়িয়ে পড়া মানুষজন হাতের রোমগুচ্ছ। যা এখন, এই শুয়ে-শুয়েই, দেখতে পাচ্ছে ঋত্বিক।

আর বেশিক্ষণ যদিও দেখতে পেল না সে, কারণ তার চোখসহ পুরো মাথাটা ঢুকে গেল এক গোলাকার যন্ত্রের মধ্যে, যার ভিতরখানা আলোকিত সাদা। স্বপ্নের মধ্যে বরফ পড়লে যেরকম হয়।

১৫

স্যাঁ রেমি-দ্য-প্রোভাঁস, ফ্রান্স

জুন, ১৮৮৯

আদরের থিও,

এখনও কিন্তু আমাকে কয়েকখানা তুলির আবদার জানাতেই হচ্ছে তোমার কাছে। যত তাড়াতাড়ি পাঠাতে পারো, ততই সুবিধে হয় আমার। সাধারণ মানের তুলি হলেই চলে যাবে আপাতত।

আশা করছি তুমি আর তোমার স্ত্রী সব দিক থেকে ভালই আছ আর চমৎকার আবহাওয়া উপভোগ করছ। অন্তত আমাদের এদিকে ভারী সুন্দর রোদ উঠছে। প্রতিদিন।

আমার কথা আর কী বলি, এমনিতে শরীর-স্বাস্থ্য ভালই যাচ্ছে। আর হ্যাঁ, মাথার ব্যামোর কথা যদি জানতে চাও, তা হলে মনে হয় সারতে সময় লাগবে আরও কিছু। ধৈর্য রাখা ছাড়া আর উপায় দেখছি না।

অ্যাসাইলামের অধ্যক্ষের সঙ্গে কালই কথা হচ্ছিল, তা উনি বললেন তোমার চিঠি ওঁর হাতে এসে পৌঁছেছে আর উনি তোমাকে তার উত্তরও লিখে পাঠিয়েছেন। আমি নিজে অবশ্য ওঁকে কোনও বিষয়ে কিছু জিগ্যেস করি না, আর উনিও যেচে আমায় জানান না কিছু। এভাবে থাকাটাই সহজ। বাতের ব্যথায় কষ্ট পাওয়া বেচারি একজন মানুষ, স্ত্রী গত হয়েছেন ক'বছর আগে। আর হ্যাঁ, উনি সারাক্ষণ খুব বিচ্ছিরি কালোমতো একখানা চশমা পরে থাকেন। এই জায়গাটা তো তেমন জমজমাট নয়, তাই ওঁকে দেখে মনে হয়, এই কাজে ওঁর অর্ধেক মনখানাই আছে যেন। বাকিটা নেই। অবশ্য তার যথেষ্ট কারণও আছে বই কী।

নতুন এক রোগী এসেছে আমাদের এখানে। সে এতটাই উত্যক্ত হয়ে আছে যে হাতের কাছে যা পাচ্ছে সব ভেঙে ফেলছে আর সেইসঙ্গে তুমুল চেঁচামেচি করছে। দিন হোক বা রাত, তার চিৎকারের কোনও বিরাম নেই। জামাকাপড় পরালেই টেনে ছিঁড়ে ফেলছে, খাবারের পাত্র উলটে দিচ্ছে, নিজের ঘরের বিছানাটাকে কেটেকুটে একাকার করেছে। আজ অবশ্য সে কিছুটা শান্তই, কারণ সারাটা দিন ধরেই সে স্নান করে চলেছে। দেখে ভারী মায়া

হচ্ছে আমার। এখানকার কর্মীদের অবশ্য অনাবিল ধৈর্য। আমার বিশ্বাস, এঁরা এই মানুষটিকেও সুস্থ করে তুলবেন।

নতুন সবকিছু কত তাড়াতাড়িই না পুরনো হয়ে যায়... আমার মনে হয়, এইমুহূর্তে আমার মানসিক পরিস্থিতি যেরকম হয়ে আছে, সেই নিয়ে যদি প্যারিসে যেতাম, তা হলে আমি তথাকথিত ডার্ক পেইন্টিং আর উজ্জ্বল ইম্প্রেশনিস্ট কাজগুলোর মধ্যে তফাত করে উঠতে পারতাম না। যেমন ফারাক করতে পারতাম না চকচকে একখানা অয়েল পেইন্টিং-এর সঙ্গে ম্যাট ফিনিশ ক্যানভাসের।

তুমি কি বুঝতে পারছ, আমি কী বলতে চাইছি? সময় যেতে-যেতে আমি এটুকু বুঝতে পেরেছি, দ্যলাক্রোয়া, মিয়ে, রুসো, দ্যুপ্রে, দোবিন্যিদের ঘরানার অনন্ত যৌবন নিয়ে যেমন আমার কোনও সন্দেহই নেই, তেমনই পূর্ণ আস্থা রয়েছে এখনকার শিল্পীদের কাজের প্রতি, বা এমনকী যারা আসতে চলেছে, তাদের প্রতিও। যদিও ইম্প্রেশনিজ়ম শেষমেশ রোম্যান্টিসিজ়মকে ছাপিয়ে যেতে পারবে বলে আমার এখনও মনে হয় না।

জানো, আজ এখানে খুব ভোরবেলায় আমি অনেকক্ষণ ধরে কেবল আকাশ দেখলাম। সূর্য তখনও ওঠেনি, কেবল শুকতারা ঝলমল করছে। আকাশ সত্যিই যে কত বিশাল, আজ ভোরে তা আরও একবার মনে হল আমার। দোবিন্যি আর রুসোর ছবিতে আমরা এমন দেখেছি। প্রশান্ত, উদাত্ত, রাজকীয়, ব্যাপ্ত আকাশ। কিন্তু সেই ব্যাপ্তির মধ্যে নিজের বেঁচে থাকার দুঃখ আর ব্যক্তিগত যন্ত্রণাকে জুড়ে দেওয়াটাও আমি শিল্প বলেই গণ্য করি।

নিজের কাজের কথা ভাবলে আজও খুব মুষড়ে পড়ি, যখন মনে হয় যা চেয়েছিলাম, তার ধারে-কাছেও পৌঁছোতে পারিনি। তারপর ভাবি, হয়তো বেশ কয়েক বছর পর সত্যিই এর চাইতে ভাল কাজ করতে পারব। তবে আমি জানি, তা হতে এখনও বহু দেরি।

এখানে এক মাসেরও বেশি সময় হয়ে গেল আমার। কিন্তু অন্য কোথাও যেতেও ইচ্ছে করে না। একবারের জন্যও নয়। কেবল কাজ করার ইচ্ছেটা আগের চাইতে আরও একটু জোরদার হয়েছে, এই যা।

শুধু আমিই নই, এখানে যারা আছে, তাদের কারও মধ্যেই অন্য কোথাও যাওয়ার আর কোনও স্পৃহা চোখে পড়ে না। হয়তো বাইরে থেকে সকলের জীবনটাই এতখানি ভেঙেচুরে গিয়েছে যে এখানেই শান্তি খুঁজছে তারা।

কিন্তু যা আমি কিছুতেই বুঝতে পারি না তা হল এদের সকলের আলস্যের কারণ। কে জানে, হয়তো দক্ষিণ ফ্রান্সের ভাঙাচোরা এলাকাগুলো থেকে এসেছে বলেই এদের এই হাল। কিন্তু এখানে কী অপূর্ব প্রকৃতি! কী অপার্থিব নীল আকাশ আর কী উজ্জ্বল একখানা সূর্য! আহা! আমি জানলা দিয়েই বাইরেটা দেখি আর তাতেই কাজের উৎসাহ পাই।

আচ্ছা, তুমি কি মপাসাঁ'র নতুন বইটা পড়তে পেরেছ এখনও? কেমন হয়েছে আমাকে জানিয়ো। ভাল বই বলতে আমি শেষ পড়েছি জোলার 'ল্য রেভ।' সেখানে সুতোর কাজ তুলতেন যে-ভদ্রমহিলা, তাঁর ফিগার সত্যিই খুব আকর্ষক মনে হয়েছিল আমার। ভারী সুন্দর। আর হ্যাঁ, সেই সোনালি সুতোর কাজের বর্ণনা! আহা! ভাল লেগেছিল, কারণ প্রশ্নটা রঙের। নানা রকমের হলুদের আসলে। কিন্তু পুরুষটির চরিত্র বড় বেশি রকমের নির্জীব ওই বইটিতে। আর ক্যাথিড্রালের বর্ণনা... ওহ্, বিষণ্ণতার নরকে নিয়ে গিয়েছিল আমাকে।

তোমাকে অনেকগুলি আঁকা পাঠিয়েছি। অতি জঘন্যগুলি আগে-ভাগেই বাতিল করে দিয়ো দয়া করে। কয়েকটি ভদ্রস্থ মনে হলে তবেই লোকজনকে দেখিয়ো।

ইন্ডিপেন্ডেন্টদের প্রদর্শনী বিষয়ে আর কী –ই বা বলি, আমার কাছে সবই এক। তুমি বরং এমন একটা ভাব কোরো যেন আমি নেই-ই। বা কোনও কাজ দেখালেও, খুব বেশি উদাসীন হোয়ো না বা আমার উন্মাদের মতো কাজগুলো দেখিয়ো না। যতদূর মনে পড়ছে, 'দ্য স্টারি নাইট' আর হলদে গাছপালার সেই ছবিদুটো বোধহয় ওয়ালনাট ফ্রেমে বাঁধানো ছিল। একেবারেই উলটোরকম রঙের দুটি ছবি। প্রথম ছবিটা দেখলে অনেকেই হয়তো আমার চেয়ে ভাল ভাবে রাতের চেহারা ফুটিয়ে তোলার রাস্তা খুঁজে পাবে।

যা-ই হোক, আপাতত আমাকে নিয়ে আর কোনও দুশ্চিন্তা রেখো না। ক্যানভাসগুলো হাতে পেলেই ভাবছি শহরতলির দিকগুলিতে বেরিয়ে পড়ব।

বাগানের ছবিটা যখন তোমার কাছে পৌঁছোবে, তুমি বুঝবে যে, এখানে আমি খুব একটা মনখারাপ নিয়ে নেই।

খুব শিগগির আবার লিখব। আপাতত তোমার আর জো-র জন্যে উষ্ণ করমর্দন রইল।

সব সময়ের জন্য তোমার
ভিনসেন্ট

চিঠিটা লেখা শেষ হতেই মাথা তুলে একবার জানলার বাইরে তাকালেন ভিনসেন্ট। এই জানলাই এখন বাকি পৃথিবীর সঙ্গে তাঁর যোগাযোগের একমাত্র রাস্তা আর এই জানলাই তাঁকে জুগিয়ে যাচ্ছে একের পর এক আঁকার রসদ। স্যাঁ রেমি-দ্য-প্রোভাঁস-এ চলে আসার সিদ্ধান্তটা অবশ্য তিনি অনেক দিন ধরেই মনে-মনে তৈরি করছিলেন, আর সে-কথা ঘুণাক্ষরেও জানতে দেননি কাউকে। এমনকী নিজের প্রিয়তম ভাই থিওকেও নয়। কেননা তিনি একরকম নিশ্চিতই ছিলেন, এ কথা জানতে পারলেই থিও জোর করে তাঁকে নিয়ে গিয়ে তুলত তার প্যারিসের বাড়িতে, যা কিনা ভিনসেন্টের মোটেই সহ্য হত না। থিও-র

সঙ্গ তাঁকে বরাবরই আরাম দেয়, ঠিক। কিন্তু মনের এই অবস্থায় প্যারিসের মতো ভিড়ভাট্টার কোনও শহর তাঁর একেবারেই ভাল লাগত না। তার চেয়ে এই বরং হয়েছে অনেক বেশি ভাল। শহর থেকে বেশ কিছুটা দূরে, ছোট্ট একটা পাহাড়ি গ্রামাঞ্চলে একখানা নিরিবিলি আস্তানা। হোক সে অ্যাসাইলাম, হোক সে গির্জা-নিয়ন্ত্রিত, কিন্তু আপাতত তাকে এভাবেই দেখতে পছন্দ করছেন ভিনসেন্ট।

শারীরিকভাবে বন্দি হয়ে থাকার, অন্যের নজরদারিতে থাকার একটা দরকার তাঁর অনেক দিন ধরেই ছিল, তাই নিজের জন্য এই ব্যবস্থা তিনি নিজেই দেখেছেন। আর দু'-এক হপ্তাও ওই হলুদ বাড়িতে একা থেকে গেলে তিনি যে নিজেকে নিয়ে কী করতেন, এ নিয়ে তাঁরও বিশেষ সন্দেহ আছে। বিশেষত যখন তাঁর আঁকার ইচ্ছে আর ক্ষমতা, দুটোই ফুরিয়ে আসছিল দিনকে দিন। আঁকতে না পারলে তাঁর আর অন্য যে-কোনও উন্মাদের মধ্যে কোনও তফাত থাকল না তো আর! এই ভেবেই মনে-মনে সেরে উঠতে চাইতেন ভিনসেন্ট। সেই সারিয়ে তুলতেই একরকম এইখানে এসে পড়া, যা কিনা ভিনসেন্টের এখন বেশ ভালই লাগছে।

বিরাট এলাকা জুড়ে ছিমছাম একটি জায়গা। গাছপালা তো আছেই, আছে খেতখামার আর পড়শিদের বসতিও। তারই মধ্যে মানসিকভাবে অসুস্থদের জন্য এই ঠিকানা। ঘুরে বেড়ানোয় কোনও বাধা নিষেধ নেই, কেবল ডাক্তার আর নার্সদের কথা শুনে নিলেই এঁরা খুশি। ভিনসেন্ট অবশ্য আজ অবধি তার অন্যথা করেছেন বলে মনে পড়ে না। দিব্যি বাধ্য হয়েই ডাক্তার আর নার্সদের সমস্ত কথা মেনে নিচ্ছেন তিনি, সময় মতো খেয়ে নিচ্ছেন সব ওষুধ। মোটের উপর, এখানকার কর্তৃপক্ষ তাঁকে নিয়ে বেশ খুশি। বাকিরা যেমন বেশ তোড়জোড় করে পাগলামি জারি রেখেছে, ভিনসেন্টের মধ্যে তেমনটা এখানে দেখেননি কেউ। বরং একটি বড় ক্যানভাস, কিছু রং আর তুলি পেলেই সে সন্তুষ্ট। এই এক মাসে কারও সঙ্গে খারাপ ব্যবহার বা কটু কথার কোনও রেকর্ড কেউ দেখাতে পারবে না। বরং ফ্রেঞ্চ আল্পস থেকে আসা বাচ্চা নার্সটির প্রতি ভিনসেন্ট ভারী সদয়ই বলতে হবে। বিকেলের পর বিকেল খোশ গল্পে ভিনসেন্ট মেয়েটির ভালবাসার কাহিনিগুলিও শুনে নিয়েছেন।

কেবল আঁকতে না পারলে, ক্যানভাসে তুলি বোলাতে না পারলে তাঁর মাথার ভারসাম্য ঠিক থাকে না। সব কিছুর পরেও বুঝতে পারেন ভিনসেন্ট, কাজ, আর আরও আরও কাজই তাঁর সুস্থ থাকার একমাত্র উপায়। এই যে আঁকার ইচ্ছে চলে যাচ্ছিল তাঁর, কেবল মনে হচ্ছিল চারপাশের সব কিছুকে ভেঙে-চুরে তছনছ করে দিই, সে যে একরকম পাগলামোই, তা কি আর ভিনসেন্ট বোঝেন না? কিন্তু বুঝেও কিছু করার থাকে না তাঁর,

যতক্ষণ না সেই প্রবল শারীরিক উন্মাদনাকে ক্যানভাসে উজাড় করে দিচ্ছেন তিনি, যতক্ষণ না সমস্ত আগুন শরীর থেকে ছড়িয়ে পড়ছে তাঁর মনে, মাথার ভিতর, নীলচে দুই চোখে আর সেখান থেকে ক্যানভাসে।

চিঠিটা ভাঁজ করতে-করতে জানলার বাইরে তাকিয়ে থাকলেন ভিনসেন্ট। তাঁর প্যারিসের কথা মনে পড়ছে না, এমনকী মনে পড়ছে না ভারী পছন্দের হলুদ বাড়িটার কথাও। কেবল মনে পড়ছে একটি ছবির কথা, যা তিনি এই ক'দিন আগেই শেষ করে পাঠিয়েছেন ভাইকে। এই জানলা আর তার বাইরের বাগানই এখন ভিনসেন্টের পৃথিবী। কিন্তু এসবের বাইরেও কোনও এক পৃথিবীর অস্তিত্ব টের পান তিনি, যখন আঁকা শুরু হয়।

সেদিন আঁকছিলেন সাদামাটা একটি রাতেরই ছবি মাত্র। কিন্তু সে যে দেখতে-দেখতে এইরকম আশ্চর্য চেহারা নেবে, তা তিনি মোটেও জানতেন না। যখন আঁকতে থাকেন ভিনসেন্ট, নিজের হাতের উপর নিজেরই নিয়ন্ত্রণ থাকে না তাঁর। নিজের মনের উপরেও থাকে না। সম্পূর্ণ অন্য একজন ভিনসেন্ট এসে যেন ছবিগুলো এঁকে দিয়ে যায়। আর তিনি, নিতান্ত সাধারণ একজন ভিনসেন্ট, দূরে দাঁড়িয়ে আর এক ভিনসেন্টকে উন্মাদের মতো এঁকে যেতে দেখেন রোজ।

এখান থেকে কিছু দূরেই দেখা যায় গোটা কয়েক লম্বা সাইপ্রেস, বেশ বিষণ্ণই তারা বলতে হবে। তার সঙ্গে আছে আরও কিছু স্থানীয় বুনো গাছের সমাহার। তারপর, নিচু-নিচু পাহাড়ের ঢালে কয়েক ঘর মানুষের বাস। আছে অবশ্য একখানা গির্জার চুড়োও। আর তারও পর, যতদূর দেখা যায়, কেবল আকাশ। তাকে শুধুমাত্র ফরাসি আকাশ বলে মানতে মন চায় না ভিনসেন্টের। এর আগে বহুবার এই ছবিখানার খসড়া করেছেন তিনি। তখন বেশ সাদামাটাই মনে হচ্ছিল তাকে। কিন্তু শেষমেশ ছবিখানা যখন আঁকতে শুরু করলেন, দেখতে পাচ্ছিলেন চোখের সামনেই, তাঁর হাত ঘোরাতে শুরু করেছে আকাশটাকে। আকাশ থেমে নেই আর, সে তার অগণিত নক্ষত্র, মেঘপুঞ্জ, ছায়াপথ আর গ্যালাক্সিদের নিয়ে ঘুরতে-ঘুরতে বয়ে চলেছে নিরন্তর এক অজানার দিকে। নক্ষত্ররা ঘুরছে, তাদের বিকিরণ ঘুরছে, ছায়াপথগুলো ঘুরে-ঘুরে বয়ে যাচ্ছে অতিদূরের দিকে, ঘুরছে গোটা ব্রহ্মাণ্ডটাই। আর এই অ্যাসাইলামের জানলায় চোখ রেখে, উন্মাদ আঁকিয়ে ভিনসেন্ট, যাকে তিনি নিজেই চেনেন না অনেক সময়ে, ধরে রাখছে সেই অতিকায় ঘূর্ণন। এ অভিজ্ঞতা তাঁর হয়েছে সেই রাতে। ছবিটা শেষ করবার পর এক রাত ঘুমোননি তিনি। ঘুমোতে পারেননি। জেগে থেকেছেন। তখন তিনি একজন শ্রান্ত সাধারণ মানুষই বটে। ছবিটার দিকে তাকিয়ে থাকতে-থাকতে ভেবেছেন, কয়েকখানা পাউন্ডের বিনিময়েও কি কেউ কিনবে না এ ছবি? তা হলে

এখানকার খরচের জন্যে ফের হাত পাততে হয় না থিওর কাছে। আজ, জানলার বাইরে তাকিয়ে, সেসব কথাই ভাবছিলেন ভিনসেন্ট।

"মসিয়েঁ, আপনার রাতের খাবার কি এখনই খেতে চাইবেন আপনি? নিয়ে আসব কি?"

নাতালিয়া নামের সেই ছোটখাটো কমবয়সি নার্সটি কখন এসে দরজার কাছে দাঁড়িয়েছে, টেরই পাননি ভিনসেন্ট। সাড়ে সাতটা বাজে, দেওয়ালের ঘড়িতে একবার দেখলেন তিনি।

"হ্যাঁ, তা আনতে পারো বই কী। তুমি খেয়েছ?"

মেয়েটি উত্তর না দিয়ে লাজুক হাসি হাসল একখানা। বহুদিন পর কারও সঙ্গে দুটো কথা বলতে ভাল লাগে ভিনসেন্টের। নইলে এখানকার সব ডাক্তার আর অফিসাররাই যথেষ্ট গোমড়া।

"চিঠি এল বাড়ি থেকে? প্রেমিক লিখল কিছু?"

"নাহ্, তার আর সময় কোথায়। সে এখন শহরের কারখানায় কাজ নিয়েছে। হয়তো ভুলেই গিয়েছে আমাকে।"

"তোমাকে ভুলে গেলে বলতে হবে তার মোটা মাথায় কিছুই নেই।"

হো-হো করে হেসে উঠলেন ভিনসেন্ট, নিজের কথাতেই। মেয়েটিও খিলখিলিয়ে উঠল। কমজোরি হলদেটে আলোয় ঝলসে উঠল তার সোনালি চুলের গুচ্ছ আর ঝকঝকে সাদা দাঁতগুলো। মেয়েটিকে তিনি কি আগে দেখেছেন কোথাও? প্রশ্নটা রোজই তিনি নিজেকে করেন, কিন্তু ভালরকম কোনও উত্তর পান না।

"যাক, এবার তুমি নিয়ে আসতে পারো রাতের খাবার। আর হ্যাঁ, এই চিঠিখানা অবশ্যই কাল সকালের ডাকে ফেলে দিয়ো। কেমন?"

খামে ঠিকানা লিখে মুখ আটকে থিওকে লেখা চিঠিখানা তিনি তুলে দিলেন নাতালিয়ার হাতে। এই প্রথম খেয়াল হল তাঁর। চিঠিখানা যখন তুলে দেবেন বলে হাত বাড়িয়েছেন ভিনসেন্ট, আর নাতালিয়াও খুব আস্তে বাড়িয়েছে তার ফ্যাকাশে, রোগা, নরম হাতখানা, আর তিনি যখন চিঠিটা তার হাতে রেখে দিয়ে একবার তাকিয়েছেন নাতালিয়ার চোখের দিকে আর নাতালিয়াও মুখ তুলে চেয়েছে সোজাসুজি, বিদ্যুতের আলোয় ভিনসেন্ট দেখতে পেলেন কমবয়সি সেই গণিকাকে, দেখতে পেলেন তিনি নিজে সাদা কাগজে মুড়ে নিজের কেটে ফেলা রক্তাক্ত কান তুলে দিচ্ছেন তার হাতে। নাতালিয়ার হাতে। এই অ্যাসাইলামই কি তা হলে সেই গণিকালয়? এক লহমায় আবার এতগুলো দিন পিছিয়ে গেলেন ভিনসেন্ট? তাঁর মাথা ঘুরতে লাগল বনবন করে, কপালের দু'পাশ চেপে ধরে তিনি ছিটকে

শুয়ে পড়লেন বিছানায় আর তাঁর সারা শরীর কাঁপতে থাকল হু-হু করে। ভয় পেয়ে যাওয়া নাতালিয়া ছুটে গেল মেট্রনকে ডাকবে বলে। জানলার বাইরে তখনও একই রাত।

১৬

অ্যাপার্টমেন্ট ২৫বি, স্কাইরাইজ়, কলকাতা
২ ডিসেম্বর, ২০১৭

আদরের ভাই,

তোকে আমি কোনওদিন মিথ্যে বলিনি, আজও বলব না। গতকালই তোর চিঠিটা পেয়েছি, আর সেই থেকে আমার মন খুবই খারাপ হয়ে আছে। আশা করি এটাকে মিথ্যে বলে মনে করবি না। এত কিছু হয়ে যাওয়ার পরেও নিজেদের প্রতি এটুকু আস্থা আমাদের নিশ্চয়ই আছে। নাকি নেই আর?

তুই যে আসছিস কলকাতায়, আমি আগে থেকেই জানতাম। স্বাভাবিক, তুই ফোন করে মাকে জানিয়েছিস। আর যেদিন জেনেছি, বিশ্বাস কর, তার পরদিনই পুরী বেড়াতে যাওয়ার প্ল্যান বানিয়েছি বন্ধুদের সঙ্গে। লেখার সময়ে বেড়াতে যাওয়ার প্ল্যান লিখছি বটে, কিন্তু ওটা ছিল আমার এসকেপ রুট। কোথাও একটা পালিয়ে যাওয়ার দরকার ছিল রে আমার। কারণ বারবার মনে হচ্ছিল তোকে সামনে দেখতে চাই না। কথাটা তুই হয়তো অন্য ভাবে নিবি, কারণ তোর পক্ষে এখন আমাকে ভুল বোঝাটা অনেকখানি সোজা, কিন্তু সত্যি এটাই যে আমি কোনও ভাবে তোর মুখোমুখি হতে চাইছিলাম না।

তুই হয়তো ভাবছিস, কেন হঠাৎ এরকম অদ্ভুত ব্যবহার করছি আমি। ভাবাটাই স্বাভাবিক, কারণ তোকে এর আগে কোনওদিন কিছু বলিনি আমি, বুঝতেও দিইনি। ভেবেছিলাম মনে রাখব না, সময়ের সঙ্গে-সঙ্গে আমি ভুলে যাব নিশ্চয়ই। কিন্তু তুই ওই কথাটা খুব ঠিক বলেছিস। সিভিলিয়ান। সাধারণ, আম নাগরিক। তাই আমি এসবের উপরে উঠে কথাটা ভুলে যেতে পারিনি।

আজ তোকে বলি, গড়পঞ্চকোটে সেই রাতে আমি তোকে আর সুদক্ষিণাকে একসঙ্গে দেখে ফেলেছিলাম। আমি তোকে খুঁজতেই ছাদে এসেছিলাম, আর তখনই দেখি তোদের। সেই রাতটা আমি আজও ভুলিনি ভাই। তার পরের অনেক-অনেক রাতও ওই একইরকম ভাবে কেটেছে। আমি ঘুমোতে পারিনি রাতের পর রাত। কারণ চোখ বন্ধ করলেই আমি

দেখতে পেতাম ওই ছাদটা, আর সেখানে তোকে আর সুদক্ষিণাকে, ওই অবস্থাতেই। উঠে বসতাম বিছানায়, জল খেতাম, সিগারেট খেতাম, কিন্তু ঘুমোতে পারতাম না।

সুদক্ষিণাকে আমি ভালবেসেছি, এতে কোনও সন্দেহ নেই। ভালবাসতাম নিশ্চয়ই। আজ আর সেই ভালবাসা সেরকম নেই। কারওরই থাকে না। কিন্তু আমি তো তোকে সুদক্ষিণার চাইতে হাজার গুণ ভালবাসি ভাই? আজও বাসি, সারা জীবন বাসব। সুদক্ষিণার জন্য আমি কোনও কষ্ট পাইনি, পারলে কথাটা বিশ্বাস করিস। ওর সঙ্গে অন্য যে-কোনও পুরুষকে সে-রাতে দেখলে আমি অনেক তাড়াতাড়ি ব্যাপারটা মেনে নিতাম, ভুলে যেতাম। সত্যিই তো, সুদক্ষিণা আমাকে তার অনেক আগেই ফিরিয়ে দিয়েছে। সুতরাং তার জীবনের কোনও ঘটনা নিয়েই আমার কিছু বলার থাকতে পারে না। আর আমি সেরকম ছেলেও নই, তুই ভালই জানিস। কিন্তু অফ অল পার্সন্‌স তুই? তুই এই কাজটা করলি? এই একটা কথাই আমি মেনে নিতে পারিনি রে।

আমার মনে হয়েছে সেদিন থেকে আমি তোকে হারালাম। সুদক্ষিণাকে বহু আগেই হারিয়েছি। আসলে হারিয়েছি কথাটাও ঠিক বলা যায় না, কারণ ওকে তো আমি পাই-ই নি। যদিও আমি ভেবেছিলাম গড়পঞ্চকোটে একবার শেষবার ওকে বলব আমার কথা। কিন্তু তার আগেই যা দেখার দেখলাম। সুদক্ষিণার কথা ছাড়। ওর উপর আমার কোনও অধিকারই নেই। কিন্তু তুই তো আমার! অন্তত আমি তাই ভাবতাম। তোর জীবনের প্রত্যেকটা ঘটনায়, বিষয়ে, ভাবনায় অধিকার আছে আমার। তোরও আছে উলটোটা। আমি অন্তত এত-এত বছর ধরে সেরকমই ভেবে এসেছি রে। কিন্তু আজ বুঝি, তুই কোনওদিন সেটা ভাবিসনি। ভাবলে সেই রাতে সুদক্ষিণার সঙ্গে ওভাবে জড়িয়ে পড়তে পারতিস না।

জানিস, যখনই মনে পড়েছে দৃশ্যটা, চারপাশের সব কিছু অসহ্য লেগেছে। মনে হয়েছে ভেঙে ফেলে দিই সমস্ত কিছু। জানিস, কত-কত দিন আর বন্ধুদের বাড়ি যাইনি আমি? মা-র সঙ্গে ভাল করে কথা বলিনি? জানিস না, কারণ তখন তোর ট্রেনিং চলছে। ভাবিসওনি, কারণ আমি হাসিমুখে তোকে ট্রেনে তুলে দিয়ে এসেছি ওই ঘটনার ক'দিন পরেই। কিন্তু কেন জানিস? আমি প্রতিমুহূর্তে ভেবেছি, এই হয়তো তুই আমার কাছে স্বীকার করবি ঘটনাটা। আজ হয়তো বলবি, হয়তো কাল। সেটুকু স্পিরিট তোর আছে। কিন্তু বিশ্বাস কর, যখন ট্রেনটা প্ল্যাটফর্ম ছেড়ে যাচ্ছে আর তুই জানলায় বসে হাসিমুখে হাত নাড়ছিস, তখন শেষবারের মতো আমার মনটা ভেঙে গিয়েছিল। আমি বিশ্বাস করতে পারছিলাম না যে শেষমেশ ঘটনাটা তুই আমার কাছ থেকে লুকিয়েই রাখলি। সুদক্ষিণার কোনও ক্ষতি আমি করিনি কোনওদিন। কিন্তু মাত্র একটা দিন সুযোগ পেয়ে সে আমার ভাইকে আমার কাছ থেকে কেড়ে নিল।

আমি অদ্ভুত একটা মানুষ হয়ে রয়েছি তারপর থেকে। নিজেকে চিনতে পারছি না, তোকেও না। কেবল মনে হচ্ছে হয় আমি একটা অন্য লোক, নইলে তুই আর একজন কেউ। কারণ দু'জনেই যদি এক মানুষ থেকে থাকি, তা হলে এত কিছু পালটে গেল কী করে মাঝখানে? আর তুই কী করে এত কিছুর পরেও আগের মতো হেসে আমাকে জড়িয়ে ধরলি, বল? তোর কাছে কি ঘটনাটা এতই ছোট ছিল?

ঘটনাটা অনেক বছর পর অনেক ছোটই হয়ে যাবে ভাই। হয়তো আমিও আজ তোর চোখে অনেকটাই ছোট হয়ে গেলাম, যা তোর চিঠি পড়েই বুঝতে পারছি। আমি সত্যিই খুব সাধারণ একটা মানুষ রে। আমার ভিতরে অনেক-অনেক ইচ্ছে আছে যেগুলো হয়তো কখনও অসাধারণ হয়ে উঠলেও উঠতে পারত, কিন্তু তার সুযোগ আমি কোনওদিন পাব বলে মনে হয় না। কিন্তু তোর আর আমার সম্পর্কটা খুব সাধারণ ছিল না, এটুকু আমি আজও গর্ব করে বলতে পারি। আর এটাও একশোবার বলতে পারি যে যা হয়ে থাকুক, সেদিনের ঘটনায় আমি যত কষ্টই পাই না কেন, তোর জন্যে আমার ভালবাসা একটুও কমেনি। আর তুই যা-ই বলিস, আমিও বিশ্বাস করি, তুই রেগে থাক, ব্যথা পাস, ভুল বোঝ, যা খুশি কর। কিন্তু আমাকে না ভালবেসে পারবি না। কোনও সুদক্ষিণাই আমাদের মাঝখানে বেশিদিন থাকতে পারবে না। কী বল?

সরি রে, হয়তো পুরী চলে যাওয়াটা ভুল হয়েছে। ছেলেমানুষি হয়েছে। কিন্তু ওই আর কী। জানিস তো, সব সময়ে সব কাজ ঠিক করে করে উঠতে পারি না। তুই অনেক বেশি গুছোনো, ফোকাস্‌ড। বাবা মা চিরকালই চেয়েছিল আমিও তোর মতো হই। কিন্তু পারলাম কই, বল?

যাক গে, এসব কথা এখন থাক। চিঠিটা পড়তে-পড়তে রেগে উঠলেও পরে একটু ঠান্ডা মাথায় ভাবিস কিন্তু, কেমন? ছুটিতে আবার কবে আসছিস জানাস, নাহলে তোর রাগ ভাঙাতে আমিই অরুণাচলে গিয়ে হাজির হব। টের পাবি তখন।

শরীরের যত্ন নিস, আর হ্যাঁ, তোর নতুন প্রেমে কীসব ঝামেলা হয়েছে বলছিলি না? ফোন করিস একদিন। না হলে লিখিস, অ্যাম অলওয়েজ় দেয়ার ফর মাই ব্রাদার।

এই চিঠিটা পোস্টে ফেলার সঙ্গে-সঙ্গে সব উলটোপালটা স্মৃতিও ফেলে দিলাম। প্রমিস। এখন টাটা, উত্তর দিস। ভালবাসা নিস রে...

তোর দাদা

শর্মিলা এই চিঠিটার কথা কোনওভাবেই জানত না। ঘটনাটার কথাও জানত না। কেবল সুদক্ষিণার প্রতি নিজের দুর্বলতার কথা তাকে অনেক দিন আগে বলেছিল ঋত্বিক। কিন্তু তার সঙ্গে যে এত কিছু জড়িয়ে আছে, সেটা সে বলেনি কোনওদিনই। আজ শর্মিলা সবটা জানতে পারল, যখন সে ঋত্বিকের পুরনো মেডিক্যাল রিপোর্টগুলো খুঁজতে গিয়ে ঢুকেছিল স্টোর রুমে। একটা বাতিল আলমারি ভরতি পুরনো কাগজপত্র, সেখানে গত দশ বছরের হাবিজাবি যাবতীয় জিনিস রাখা আছে। ব্রেন স্ক্যান রিপোর্ট কাল সকালে পাওয়া যাবে, তার পাশাপাশি রুখসার ঋত্বিকের গত দশ বছরের রেকর্ডস দেখতে চান। নিয়ে যেতে হবে কাল সকালেই। ডিনারের পর ঋত্বিক যখন ঘুমের ওষুধের ঘোরে শুয়ে পড়েছে, তখন এ ঘরে ঢুকে আলমারি খুলে রিপোর্টগুলো খুঁজছিল শর্মিলা। প্রায় কুড়ি-বাইশটি রিপোর্ট সে পেয়েছে, আর সেইসঙ্গে পেয়েছে চিঠিটা। পাশে সৌপ্তিকের পাঠানো আগের চিঠিটাও যত্নে রাখা আছে, যেটা সে এর আগেই পড়েছে আর তার চোখের সামনে খুলে গিয়েছে এতদিনকার না-জানা একটা ঘটনা। তার চেয়েও বেশি করে তাকে ভাবিয়েছে ঋত্বিকের লেখা চিঠির তারিখটা। এ চিঠি লিখে তার পরদিনই তো পোস্ট করবার কথা। কিন্তু তা যে কেন করা হয়নি আর...

ঋত্বিক পাশ ফিরে ঘুমোচ্ছে, শর্মিলা গিয়ে দাঁড়িয়েছে তার পাশে। চুল এলোমেলো, বহুদিন কাটা হয়নি। ক্লান্ত, অর্ধেক অচেনা মানুষটার চুলের জঙ্গলে আস্তে করে হাত ঢুকিয়ে দিল শর্মিলা। যে জঙ্গলের নীচে নরম মাটি, আর মাটির নীচে বুকে হেঁটে ঘুরে বেড়াচ্ছে রাতের স্বপ্ন। যা, এই বাইরে থেকে, কিছুতেই দেখতে পাচ্ছে না শর্মিলা।

১৭

ক্লিনিক ওপেন মাইন্ড, কলকাতা
৩ ডিসেম্বর, ২০১৭

"আমাদের একটা ভাল ঠেক ছিল হিমাংশুদের বাড়িতে। আলিপুরে ওদের একটা পুরনো বাড়ি ছিল, পেল্লায়। সেখানে আমরা ক'জন মিলে মাঝে-মধ্যেই আড্ডা দিতাম, আমি রেগুলারলি কাজ করতাম। আমার ক্যানভাস, কাজের সরঞ্জাম সব ওখানেই পড়ে থাকত বেশির ভাগ সময়। বাড়িতে অত জায়গা ছিল না তো, তাই।"

"হিমাংশু কে?"

"আর্ট কলেজেরই বন্ধু। ও শখে আঁকা শিখতে এসেছিল, তেমন ভাল হাত ছিল না ফ্র্যাঙ্কলি। কিন্তু ভাল বন্ধু ছিল। আমাদের সকলের জন্যে হাত খুলে খরচ করত সব সময়।"

এই কথাগুলো হচ্ছে রুখসার আহমেদের চেম্বারে, যখন শর্মিলা আর ঋত্বিক সকাল-সকাল হাজির হয়েছে সেখানে আর শর্মিলার হাতে রয়েছে সব রিপোর্ট। সেইসঙ্গে এমন সব ঘটনা যা সে কাল রাতের দুটো চিঠি থেকে প্রথম জানতে পেরেছে এবং যেসব কথা ডাক্তারের সঙ্গে ভাগ করে না নিলেই নয়। শর্মিলা ভেবেছে সন্ধের পর আর একবার রুখসারের সঙ্গে দেখা করে কথাগুলো বলে ফেলবে। স্ক্যানের রিপোর্টে যদিও তেমন ঝামেলার কিছু পাওয়া যায়নি। ওরা ঢোকামাত্রই একগাল হেসে সেটা জানিয়ে দিয়েছেন রুখসার। আজ প্রথম কলকাতায় একটু-একটু উত্তুরে হাওয়া বইতে শুরু করল। আসার পথে একজনকে মাফলার জড়িয়ে নিতে দেখে ভারী ভাল লেগেছে শর্মিলার।

রুখসার জিগ্যেস করছিলেন ঋত্বিককে, কেবলমাত্র বাবার কথাতেই কি সে আঁকা ছেড়ে দিল? এতটাই ঠুনকো ছিল তার প্যাশন? নাকি আরও কিছু আছে এর পিছনে? সরাসরিই প্রশ্নখানা রেখেছিলেন রুখসার। আর ঋত্বিকও বুঝে গিয়েছে, এখন ক'দিন তাকে কিছু-কিছু প্রশ্নের উত্তর দিতে থাকতে হবে, যেখানে সত্যি বলা ছাড়া কোনও রাস্তাই নেই আর। নইলে তার অসুখ... অবশ্য এটাকে অসুখ বলা যায় কি না সে নিজে এখনও জানে না, তার সমাধান খুঁজে পাওয়া যাবে না কিছুতেই।

নইলে তার যে সারাক্ষণ খুব অসুবিধে হচ্ছে এসবের জন্য, তা কিন্তু নয়। অন্তত তার নিজের খুব একটা ঝামেলা হচ্ছে না, এই আপাতত অফিস থেকে ছুটি পেয়ে বাড়িতে বসে থাকা ছাড়া। কখনও-সখনও ভেবে দেখেছে সে, এমনকী সেই ব্যাপারখানাও মন্দ লাগছে না তার। কলকাতায় শীত পড়তে দেখা বাড়ির বারান্দায় কফি কাপ হাতে, এমন বিলাসিতা সে শেষ কবে করতে পেরেছে, আজ আর মনে নেই। কিন্তু শর্মিলাকে দেখে তার বরং দুশ্চিন্তা হয়। সে নিজে যতটা না অসুবিধেয়, তার চেয়ে ঢের বেশি দুশ্চিন্তায় পড়ে কেমন যেন চুপচাপ হয়ে যাচ্ছে শর্মিলা। অন্যমনস্ক হয়ে যাচ্ছে আস্তে-আস্তে। তারও সমস্তরকম কাজের ক্ষতি হচ্ছে তো। এইটা ভাবলেই, কেবলমাত্র এইটা ভাবলেই নিজেকে নিয়ে খারাপ লাগতে থাকে ঋত্বিকের।

না হলে কাল বিকেলে যখন চা বানাতে গিয়ে ঋত্বিক হঠাৎ দেখল তাদের রান্নাঘরের ডেকটা ছোট হতে-হতে তার পায়ের কাছে পড়ে থাকা একটা সুটকেস হয়ে গিয়েছে যাকে সে কিছুতেই নিজের বলে চিনতে পারছে না, অথচ তার কোনা থেকে নিজের একখানা শার্টের হাতা বেরিয়ে থাকতে দেখে স্পষ্টই বুঝতে পারছে যে সুটকেসখানা সে-ই এনেছে এখানে, এইখানে, যেখানে তার ঠিক সামনে থেকে শুরু হচ্ছে মাইল-মাইল দুপুরের গরম মরুভূমি, বালি উড়তে থাকা, তাপ ভাসিয়ে নিয়ে যেতে থাকা, মুখ-চোখ ঝলসে দেওয়া হলুদ সোনালি আর বাদামি মরুভূমি, যার বালিয়াড়ি পেরিয়ে কেবল দেখা যাচ্ছে আরও বালিয়াড়ি, কিন্তু একটা মানুষকেও কাছে-পিঠে দেখা যাচ্ছে না, তখন ঋত্বিকের মন্দ লাগেনি মোটেই আর সে কথা সে এখনও হলপ করেই বলতে পারে।

তার ঠিক পিছন দিকটায়, ঘুরে না তাকিয়েও বুঝতে পারছিল ঋত্বিক, সটান চলে গিছে একটা রেল লাইন, যার উপর দিয়ে দিনে মাত্র একবারই ট্রেন যায় একটা, যে-ট্রেন নিশ্চিত তাকেও একটু আগেই নামিয়ে দিয়ে গিয়েছে এই জনহীন মরুভূমির একধারে, যেখান থেকে সে কোথায় যাবে কিছুই বুঝে উঠতে পারছে না।

দৃশ্যটা বড়জোর মিনিটখানেক ছিল, কিন্তু ভেঙে যাওয়ার পর ঋত্বিকের মনে হয়েছিল সে যেন সারা দুপুর ওই গরম মরুভূমির রেল লাইনের ধারে দাঁড়িয়ে থেকেছে। এতটাই বাস্তব ছিল তার দেখা সেই দৃশ্য।

তা, যা-ই হোক, রুখসার জিগ্যেস করছিলেন ঋত্বিককে, কেবলমাত্র বাবার কথাতেই কি সে আঁকা ছেড়ে দিল? এতটাই ঠুনকো ছিল তার প্যাশন? নাকি আরও কিছু আছে এর পিছনে? প্রশ্নটা শোনামাত্র ঋত্বিকের চোখের সামনে ভেসে উঠল হিমাংশুর হাসিমুখ, যা সে ভুলতে চায় না একদিনের জন্যও।

"ওর বাড়িতে কি রোজই আড্ডা হত?"

"রোজ না হলেও, হপ্তায় দিন তিন-চারেক তো হতই।"

"এখানে একবার ইন্টরাপ্‌ট করছি ঋত্বিক, ওই সময়, মানে যখন তুমি কলেজে পড়ছ, আঁকছ... এইরকম অন্য কিছু দেখতে পাওয়া, এই ব্যাপারটা তখন কি একেবারেই হত না?"

"একেবারেই না।"

"শিয়োর?"

"শিয়োর।"

"ওকে। তারপর বলো..."

"এমন অনেকদিন হয়েছে, আমি কলেজ থেকে ওর বাড়ি গিয়ে কাজ শুরু করেছি, তারপর এমন আটকে গিয়েছি যে টানা দু'দিন থেকেই গিয়েছি ওর বাড়িতে। ওর বাবা-মা, মানে মাসিমা-মেসোমশাই খুব ভালও বাসতেন আমাদের, এত অত্যাচার সব হাসিমুখেই সহ্য করতেন। ইন ফ্যাক্ট, বলতে পারেন, হিমাংশুদের বাড়িটা একরকম আমার নিজের বাড়িই হয়ে গিয়েছিল। কারণ আমার বাড়িতে তখন অত ক্যানভাস, রং, তুলি, কিছুই ছিল না। আর সাম হাউ, আঁকা আর তার সরঞ্জাম যেখানে থাকত, সেটাকেই আমার বাড়ি বলে মনে হত। আই ফেল্ট ভেরি সিকিয়োর। তাই কাজ শেষ হলে সব ওর স্টুডিয়োর ঘরেই রাখা থাকত। বয়ে-বয়ে আর বাড়িতে আনতাম না।"

"কতগুলো ছবি, মনে আছে?"

"তা গোটা পনেরো-ষোলো তো হবেই। টানা এক বছর ধরে ওর বাড়িতে কাজ করে গিয়েছি তো।"

"তারপর? এমন কী হল?"

"একদিন সকালে ওদের বাড়িতে গিয়ে দেখি ওরা নেই। দারোয়ান বলছে, সবাই দিল্লি চলে গিয়েছে। একটু অবাকই লাগল। হিমাংশু আগের দিনও কলেজ এসেছে, কিছুই বলেনি দিল্লি যাওয়ার কথা। আমাকে জেনারেলি ও সবই বলত। দারোয়ানের কাছে শুনলাম, দিদির বাড়িতে গিয়েছে। হিমাংশুর দিদি দিল্লিতে থাকে, এটা আমরা জানতাম। কাজের ঘরে ঢুকতে চাইলাম, দারোয়ান বলল তালা দেওয়া আছে, চাবি তার কাছে নেই। আমি বেশ একটু মনমরা হয়ে বাড়ি ফিরে এলাম।"

শর্মিলা অবাক হয়ে শুনছে। কারণ এসবের সে কিছুই জানে না। এমবিএ করতে গিয়ে যে-ঋত্বিককে সে দেখেছে, সে একেবারেই ছিল অন্য মানুষ। তারপর, একসঙ্গে থাকতে গিয়ে তাকে আলাদা ভাবে চিনলেও, এই এত-এত কথা তাদের মধ্যে আঁকা নিয়ে, আঁকার দিনগুলো নিয়ে কখনওই হয়নি, কারণ প্রসঙ্গ উঠলেই, স্পষ্ট বুঝতে পারত শর্মিলা, আঁকা বিষয়ে কোনও কথাই বলতে চায় না ঋত্বিক। তাই বহুদিন তাদের মধ্যে এসব নিয়ে কোনও

বাক্যালাপই হয়নি। আজ, তার এই অসুখ, তার মধ্যে থেকে এতকিছু বের করে আনছে। অবাক হয়ে, সত্যিই অবাক হয়ে শুনতে থাকল শর্মিলা।

"কলেজ চলতে থাকল, সাত দিন, দশ দিন, হিমাংশুর পাত্তা নেই। তখন সেল ফোন আসেনি যে খোঁজ করে দেখব। দিন পনেরো পর আবার কলেজে ফিরল হিমাংশু। কিন্তু কেমন যেন হয়ে গিয়েছে। খুলে কথা বলছে না, বেশিক্ষণ আড্ডা দিচ্ছে না। সবচেয়ে বড় ব্যাপার, ওর বাড়িতে যাওয়ার কথা উঠলেই কোনও না কোনও ভাবে এড়িয়ে যাচ্ছে। ভেরি আনলাইক হিমাংশু আর কী। আমি আর আমার কয়েকজন বন্ধু, যারা রেগুলারলি ওর বাড়িতে যাতায়াত করতাম, তারা অনেক চেষ্টা করেও কোনও কারণ বের করতে পারলাম না। শুধু এটুকু বুঝলাম, এমন কিছু একটা হয়েছে, যার পর ও আর সেভাবে আমাদের কারও সঙ্গেই মিশতে চাইছে না।"

"স্ট্রেঞ্জ!"

"হ্যাঁ, আমাদের সকলেরও এটাই মনে হয়েছিল। ভাবছিলাম হয়তো কোনও প্রেম ভেঙে গিয়েছে, আমাদের জানাতে চাইছে না। এর পর অবশ্য প্রায় মাস তিনেক কেটে গিয়েছে। কয়েকবার হিমাংশুর বাড়ি থেকে কাজগুলো নিয়ে আসব বলে ভেবেছি, কিন্তু যতবারই ওকে বলেছি, ও কোনও না কোনও বাহানা দিয়ে ওর বাড়িতে যাওয়ার ব্যাপারটা এড়িয়ে গেছে। তারপর আমিও ভেবেছি, ওর বাড়িতেই কাজগুলো ভাল অবস্থায় থাকবে। ওই অতগুলো কাজ বাড়িতে এনে কোথায় রাখব, সে-ও তো ভাবার ব্যাপার। তা ছাড়া, আমি তখনও ভাবছিলাম, ওটা একটা পাসিং ফেজ। কোনও কারণে হিমাংশু কোনও একটা ঝামেলার মধ্যে আছে, সেটা মিটে গেলেই এভরিথিং উইল বি নর্ম্যাল।"

"সেটা হল আলটিমেটলি?"

"না। বরং মাস চারেক বাদে কলেজ থেকে একটা সেমিনারে আমাকে পাঠানো হল দিল্লি। তার আগে একবারই বাবা-মা-র সঙ্গে বেড়াতে গিয়েছিলাম, তা-ও অনেক ছোটবেলায়। এবার অবশ্য বেড়াবার কোনও উপায় ছিল না, কারণ দু'দিনের সেমিনার শেষ করেই ফিরে আসা। কলেজে পরীক্ষা শুরু হবে পরের হপ্তায়। দিল্লিতে একটা গেস্ট হাউজে একার রুম, প্রথম দিনের সেমিনার শেষ হওয়ার পরেই কাছাকাছি একটা দোকান থেকে ছোট হুইস্কি কিনে নিয়ে ঘরে ফিরেছি। স্নান সেরে সেটা নিয়ে বসতে যাব, কিন্তু আর বসা হল না।"

"কেন?"

"হুইস্কির প্যাকেটটা একটা কাগজ দিয়ে মুড়ে দিয়েছিল। খবরের কাগজ। 'দিল্লি টাইমস'-এর একটা পুরনো পাতা। তাতে একটা ছবি দেখে চিনতে পারলাম। একটা আর্ট

এগজিবিশনের রিভিউ ছাপা হয়েছে, সঙ্গে তিনটে বাছাই ক্যানভাসের ছবি। তিনটেই আমার আঁকা। সবচেয়ে পছন্দের যে-ছবিটা আমার, একটা মুরগির বাস্ট, চিৎকার করছে মুরগিটা, আরও অনেক এলিমেন্ট ছিল ছবিটায়... যা-ই হোক, সেই ছবিটাই সবচেয়ে বড় করে ছেপেছে। কাগজটা খুললাম। মাস চারেক আগে একটা গ্যালারিতে সোলো এগজিবিশন। নতুন আর্টিস্ট, হিমাংশু চৌধুরি।"

"মানে? হাউ মিন! তোমার আঁকাগুলো চুরি করল?"

"আপনি যেভাবে দেখবেন। রিভিউটা পড়লাম। মোস্ট প্রমিসিং বলা হয়েছে শিল্পীকে। মোস্ট প্রমিসিং। কথাটা মাথার মধ্যে ঘুরতে লাগল। মোস্ট প্রমিসিং। মোস্ট প্রমিসিং। পরদিন সেমিনারে গেলাম না। রাতের ট্রেন ছিল, ধরলাম। ফিরে এলাম। কলেজ গেলাম না। ইন ফ্যাক্ট, আর কোনও দিনই গেলাম না। বাবাকে গিয়ে বললাম, ভুল বুঝতে পেরেছি, আর্ট কলেজ কমপ্লিট করব না। বাবা, এখন বুঝতে পারি, একটু অবাক হয়েছিলেন। তার পরের সেশনে এমবিএ জয়েন করি। সেখানেই শর্মিলার সঙ্গে দেখা হয়। কিন্তু দ্যাট ইভনিং আই ডিসাইডেড, আঁকব না।"

শর্মিলা বাঁ হাতটা ঋত্বিকের ডান কাঁধে রেখেছে। রুখসার চুপ করে থেকে বললেন, "কিন্তু এভাবে ছেড়ে দিলে? তোমার মনে হল না একবার বন্ধুটিকে গিয়ে সমস্তটা বলা দরকার? একজন মানুষ অন্যায় করেছে বলে তুমি স্যাক্রিফাইস করলে কেন?"

"আমার আর ওসব ইচ্ছে হয়নি। স্যাক্রিফাইস কি না জানি না, কিন্তু উদ্যম ছিল না আর। বিশ্বাস করুন। ইচ্ছেও ছিল না। নষ্ট হয়ে গিয়েছিল সব।"

"আই ক্যান আন্ডারস্ট্যান্ড।"

শর্মিলা একবার একটু চাপ দিল ঋত্বিকের কাঁধে।

ঋত্বিক দেখতে পেল একটা কার শেড। বাদামি খয়েরি জং ধরে যাওয়া ছাউনিওলা একটা বিরাট কার শেড, যার মধ্যে কোনও রকমে আশপাশ দিয়ে ঢুকে আসছে বিকেলের রোদ। একের পর এক বাতিল হয়ে যাওয়া ট্রাম দাঁড়িয়ে আছে সার বেঁধে, তাদের আর কোথাও যাওয়ার নেই। তাদের গায়ের বিজ্ঞাপন আবছা হয়ে এসেছে, জানলার শিকে মরচে আর ঝুল। ঋত্বিক তাদের মাঝখানে একলা দাঁড়িয়ে আছে। বাইরে সম্ভবত বিকেলই হয়ে আসছে। মাটি দেখা যাচ্ছে না, কারণ আগাছা বেড়ে উঠেছে হাঁটু পর্যন্ত। আর কেউ কোথাও নেই, কেবল দূরে একটা রেডিয়ো বাজছে। ইয়ে হ্যায় রেশমি জুলফোঁ কা অন্ধেরা না ঘবরাইয়ে... এসপ্ল্যানেড-এর বোর্ড ঝোলানো একটা স্থবির ট্রামে উঠে জানলার সিট নিল ঋত্বিক। ট্রাম না ছাড়া পর্যন্ত আর কোনও উপায় নেই এখন। হঠাৎ অনেকগুলো সার্কাসের মেয়ে খিলখিল করতে-করতে উঠে পড়ল তার কামরাটায়। তাদের পোশাক, মেক আপ সব

সার্কাসের। গা থেকে বাঘের গন্ধ বেরোচ্ছে। সে বিরক্ত হয়ে উঠে পড়তে যাবে, এমন সময়ে পিছন থেকে কাঁধে হাত রেখে চাপ দিল কেউ একজন। ঋত্বিক ঘাড় ঘুরিয়ে দেখে, উর্দি আর টুপি পরা ট্রাম কন্ডাক্টর। হাসছেন। আর বলছেন, "কোন শো দেখবেন? ম্যাটিনি?"

১৮

যে-কোনও কফিশপ
কলকাতা, ৭ ডিসেম্বর, ২০১৭

"তার মানে তো ও সুস্থ?"

"স্ক্যান আপাতত তাই বলছে। কিছু তো দেখায়নি।"

"তা হলে এইসব হচ্ছে কেন?"

"শর্মিলা, আমরা এখনও হিউম্যান ব্রেনের বেশিরভাগ ফাংশন বুঝতেই পারিনি। পৃথিবীতে সবচেয়ে কমপ্লিকেটেড যন্ত্র যদি কিছু থাকে, তা হলে সেটা আমাদের ব্রেন। ধরো, ব্রেন যদি একটা বড় শহর হয়, তাতে যদি সব মিলিয়ে হাজারটা রাস্তা থাকে, আমরা এতদিনে খুব বেশি হলে পাঁচ থেকে সাতটা রাস্তা ভালভাবে জানি। বাকি রাস্তাগুলোয় কী আছে, কী হয়ে চলেছে, তারা কীভাবে কাজ করে, আমাদের কাছে কোনও ক্লু নেই।"

"তা হলে?"

"তা হলে এই যে ব্রেন স্ক্যানে যে গোটা ব্যাপারটা ক্লিয়ার দেখাচ্ছে, দ্যাট ক্যান বি আ ক্যামোফ্লাজ। একটা ছদ্মবেশ। যাকে তুমি উপর-উপর দেখে জাজ করতে পারবে না। কিচ্ছু ধরতে পারবে না যে তার ভিতরে কী-কী হয়ে চলেছে। বোঝাতে পারছি?"

"তা হলে আপনি বলছেন যে, ঋত্বিকের অসুখটা আরও গভীর?"

"আপনি নয় প্লিজ, তুমি।"

রুখসারকে আজ বেশ চিন্তিত দেখাচ্ছে। ঋত্বিকের সঙ্গে শেষ একটা সেশন হয়ে যাওয়ার পর থেকেই রুখসার চাইছিলেন শর্মিলার সঙ্গে আলাদা করে বসতে। ওষুধ তো ওষুধের মতো করে চলতেই থাকছে সেই কবে থেকে, কিন্তু এবার হয়তো-বা তার চাইতেও বেশি কিছু দরকার হতে পারে, সেটা আলোচনা করার জন্যেই এই ক্যাফেতে বসা। রুখসার একটা আমেরিকানো শেষ করেছেন একটু আগে, গ্লাসটা এখনও সামনে রাখা আছে তাঁর। কলকাতার শীত বাইরে আস্তে-আস্তে জমছে। ট্র্যাফিকে একটা শান্ত গাড়ি দাঁড়িয়ে, তার পিছনের জানলা থেকে এক আদুরে গোল্ডেন রিট্রিভার মুখ বাড়িয়ে ঠান্ডা হাওয়া খাচ্ছে। তার পাশেই একটা লাল বাস্কেট, আর তার পাশের সিটে ছোট্ট দুটো ছেলেমেয়ে খুনসুটি

করছে। সামনের সিটে কারা, সেটা ঢেকে দিয়েছে একখানা ট্রাক। তবু বুঝতে অসুবিধে নেই যে শীতের এই মোলায়েম দুপুরে বেড়াতেই যাচ্ছে তারা। আর এক কাপ কফি আসায় চটক ভাঙল শর্মিলার।

"তুমি বলছ, ঋত্বিকের অসুখটা আরও গভীরে?"

"আই অ্যাম অ্যাফ্রেড, ইয়েস। খুবই গভীরে। ইন ফ্যাক্ট, এবার আমার বেশ দুশ্চিন্তা হচ্ছে। মেডিসিন ইজ় নট দ্য ওনলি ওয়ে।"

"কিন্তু এই হ্যালুসিনেশন কতদিন চলতে পারে রুখসারদি? এটা টেম্পোরারি ফেজ় নয় বলছ?"

"দ্যাখো, এর উত্তর আমরা কেউই জানি না। জানলে সুবিধে হত, কিন্তু জানি না। কী জানো, হ্যালুসিনেশন আর ইম্যাজিনেশনের মধ্যে দিয়ে খুব সরু একটা লাইন গিয়েছে। যে নিজে দেখছে এসব, সে নিজেও জানে না কোনটা হ্যালুসিনেশন আর কোনটা ইম্যাজিনেশন। আমরাও জানি না।"

"কিন্তু ইম্যাজিনেশন তো বাচ্চাদেরও থাকে, তাই না?"

"থাকে তো। মানুষমাত্রেই থাকে। কিন্তু তার একটা ডেফিনিট পারসেন্টেজ আছে। যার বেশি হয়ে গেলে সেটা আর কেবল ইম্যাজিনেশন থাকে না। সেটা বাস্তবের কম্পিটিটর হয়ে ওঠে। রাইভ্যাল হয়ে ওঠে। ইকুয়াল হয়ে ওঠে। অনেক সময়ে বাস্তবের চাইতেও বেশি রিয়্যাল হয়ে ওঠে। আর সেখানেই ঝামেলাটা হয়।"

"শুধু ইম্যাজিনেশন?"

"ইম্যাজিনেশন আর হ্যালুসিনেশন অনেক সময়ে একে অপরকে এনহ্যান্স করে, জানো তো? একটা আছে বলেই আর একটা তার সাপোর্ট পেয়ে বাড়তে থাকে। আর এই দুটো হাতে-হাত মিলিয়ে কাজ শুরু করলে বাস্তব, অর্থাৎ রিয়্যালিটি হয়ে আসে মাইনরিটি। সংখ্যালঘু। ইটস আ গেম অফ পারসেন্টেজ। এই যে আমি-তুমি বসে আছি, কফি নিচ্ছি, এই গোটা ব্যাপারটা, তার বাইরেও রোজকার জীবনটাই তো তোমার কাছে রিয়্যালিটি, না?"

"হ্যাঁ, তা-ই তো।"

"বেশ। আর রাতে যদি সমুদ্রের স্বপ্ন দ্যাখো এক মিনিট? সেটা তোমার কাছে স্বপ্ন। তা-ই তো?"

"হ্যাঁ, তা-ই।"

"আচ্ছা, তা হলে এই যে আমরা কফি খাচ্ছি, এটা তোমার স্বপ্নের বাইরে, তুমি শিয়োর?"

"মানে?"

"মানে এই এখন যা হচ্ছে, সারাদিন ধরে যা হবে, সেটাই যে আসলে বাস্তব, এ বিষয়ে তুমি শিয়োর?"

"শিয়োর না হওয়ার কী আছে? এটাই তো বাস্তব। কারণ এটা হচ্ছে।"

"ঠিক। হচ্ছে। কিন্তু তোমার স্বপ্নের মধ্যে যখন সমুদ্রের ঢেউ আছড়ে পড়ছে, সেটাও তো বাস্তব। নয়? তুমি তো দেখছ সেটা!"

"দেখছি, কিন্তু সে তো ঘুমের মধ্যে। স্বপ্নে। চোখ খুললেই তো রিয়্যালিটি।"

"এগজ্যাক্টলি এটাই আমার পয়েন্ট। চোখ খুললে। চোখ খুললে তবেই তো রিয়্যালিটি। তুমি এক মিনিট স্বপ্ন দ্যাখো আর ষোলো ঘণ্টা জেগে থাকো। তাই তোমার রিয়্যালিটি তোমার কাছে ক্লিয়ার। কিন্তু ধরো, কেউ যদি এক ঘণ্টা জাগে আর চোদ্দ ঘণ্টা স্বপ্ন দ্যাখে, দেখতেই থাকে, তার কিন্তু একটা সময়ের পর ব্যাপারটা উলটে যাবে।"

"মানে?"

"মানে তার কাছে ওই চোদ্দ ঘণ্টার স্বপ্নই হয়ে উঠবে রিয়্যাল, আর জেগে থাকা অবস্থার এক ঘণ্টা আনরিয়্যাল। সে তখন স্বপ্নকেই বিশ্বাস করতে শুরু করবে। কারণ তার চব্বিশ ঘণ্টা সময়ের মেজরিটি তখন স্বপ্নের হাতে। বাস্তব মাইনরিটি। সংখ্যালঘু। এক কথায়, দ্য উইকার কমিউনিটি।"

"কিন্তু ঋত্বিক তো স্বপ্ন দেখে না। ও তো হ্যালুসিনেট করে।"

"হ্যাঁ, হ্যালুসিনেট করে, কখনও ইম্যাজিন করে। এটা দিনে দু'-তিনবার হচ্ছে এখন, কিন্তু খুব স্ট্রং ইমেজেস দেখছে। এবার এটা বাড়তে থাকবে। ও এই ইম্যাজিনেশন বা হ্যালুসিনেশন হোয়াটএভার, এর মধ্যেই বাঁচতে শুরু করবে। এটা হয়। এরকম রেকর্ডেড কেস অনেক আছে। এই ইমেজ দেখার সময়টা বাড়তে-বাড়তে এক সময় মেজরিটি হয়ে উঠলেই বাস্তব পৃথিবীটা ওর কাছে দূরের আর অবাস্তব হয়ে উঠবে। বাস্তব লোকজন তখন ওর কাছে ইম্যাজিনারি। ইম্যাজিনেশনের লোকজন ওর কাছে রিয়্যাল। পুরো খেলাটা এক মিনিটে ফ্লিপ করে যাবে। ইটস আ ডেঞ্জারাস গেম শর্মিলা। একটা জটিল সুড়ঙ্গ, যার শেষে অন্ধকার ছাড়া কিছু নেই। বোঝাতে পারছি এবার?"

শর্মিলা খুব শক্ত করে কফির কাপটা আঁকড়ে ধরল। ঠান্ডা হয়ে গেছে কাপটা। শর্মিলার চোয়ালের আকৃতি বাইরে থেকে দেখতে পেলেন রুখসার। তিনি জানেন, এই কথাটা শোনাও কতখানি কঠিন হতে পারে। মেনে নেওয়া তো পরের বিষয়। তিনি তাঁর ডান

হাতটা টেবিলের উলটোদিকে বসা শর্মিলার বাঁ হাতের উপর রাখলেন। শর্মিলা তাকিয়ে আছে বাইরের দিকে, জানলার বাইরে, যেখানে এখন এই পড়ে আসা দুপুরবেলায় ঝুঁকে পড়ে ম্যাগাজিন কিনছেন এক ভদ্রলোক, তাঁর শার্টের পকেট থেকে পেন পড়ে যাচ্ছে ফুটপাতে। তার একটু দূরে, রাস্তার ওপারে দাঁড়িয়ে এসএমএস করছে একটি কমবয়সি মেয়ে, তার কুর্তিটা ভাঁজ খেয়ে গিয়েছে বড্ড। তারপর একটা বড়সড় পার্ক, সেখানে কোনও বাচ্চা নেই। একটা গাছ একাই দাঁড়িয়ে আছে। বেশ শব্দ করে একটা প্লেন উড়ে গেল এক্ষুনি।

"কিন্তু, এরকম হল কেন ওর? ট্রমা?"

"শুধু যে ট্রমা থেকে হয়েছে, আমি তা বলব না। ডেফিনিটলি ট্রমা একটা ফ্যাক্টর, কিন্তু সবটা নয়।"

"তা হলে? ওয়র্ক প্রেশার? রিসেন্টলি খুব বেশি চাপ নিয়ে ফেলছিল।"

"একেবারেই নয়। আমি বলব, পাস্ট। অতীত। অতীতের কিছু ঘটনা। সবই যে দুঃখজনক, তা কিন্তু নয়। অনেক সুখের স্মৃতির কাছেও মানুষ খুব ডেসপারেটলি ফিরে যেতে চায়, সেটাকে বাস্তব হিসেবে ভাবতে ভালবাসে। এবার, যারা ওভার-ইম্যাজিনেটিভ, লাইক ঋত্বিক, তাদের কাছে এই কল্পনাটা খুব সহজে বাস্তব হয়ে ওঠে। ইন ফ্যাক্ট, নানা এলিমেন্ট জুড়তে-জুড়তে এক সময়ে একটা প্যারালাল ইউনিভার্স বা সমান্তরাল জগৎ তৈরি হয়ে যাওয়াটাও অবাস্তব নয়। মানে বুঝতে পারছ? এই বাস্তব পৃথিবীতে তাকে যা-যা ঘিরে রয়েছে, সব কিছুর একটা প্যারালাল এগজিসটেন্স তৈরি হয়। অ্যাজ ইফ, একটা রেপ্লিকা। ফলে পেশেন্ট তার ওই ইম্যাজিনারি জগতে সেরকম কোনও অসুবিধে বা ফাঁক খুঁজে পায় না আর। বরং এই রিয়্যালিটি তাকে অনেক বেশি অস্বস্তিতে ফেলে। তাই সে আর এখানে ফিরতে চায় না তখন। হি অর শি বিকামস আ রেসিডেন্ট অফ দ্যাট অলটার ইউনিভার্স।"

"তা হলে এই রিয়্যালিটি, এই জীবন ওর ভাল লাগছে না। তা-ই তো?"

"শুনতে খারাপ লাগলেও, কিছুটা তো সত্যিই। লাগছে না। ওকে বারবার ওর অতীত টানছে। আর ও সেখানেই বাঁচতে চাইছে। এখানে কিন্তু আর একটা ফ্যাক্টর খুব কাজ করে শর্মিলা।"

"কী?"

"উইশ ফুলফিলমেন্ট। ইচ্ছাপূরণ। কেউ যদি কোনও তীব্র ইচ্ছে বা প্যাশনকে চাপা দিয়ে, পারস্যু না করে দিনের পর দিন বাঁচতে থাকে, তা হলে এক সময়ে একটা এক্সপ্লোশন হয় ভিতরে। ডিপ্রেশনের, আর ইচ্ছের। তখন সে যা পারেনি, সেটা নিয়েই ইম্যাজিন করতে

থাকে। ইম্যাজিনেশনের ভিতরেই তার একটা উইশ ফুলফিলমেন্ট হয়, যেটা সে বাস্তবে পারে না আর।”

“ঋত্বিকের ক্ষেত্রে সেটা আঁকা। পেইন্টিং।”

“এগজ্যাক্টলি। পেইন্টিং। আঁকা নিয়ে ওর অনেক সুখের স্মৃতি আছে, ট্রমাও আছে। সেইসঙ্গে ওর অতীতজীবনের পারসোনাল ট্রমাগুলোও ইনকর্পোরেটেড হয়েছে। কিন্তু আলটিমেটলি ও যে একজন পেইন্টার হতে পারেনি, কিন্তু চাইলে পারত, এটা একটা অবসেশন হয়ে দাঁড়িয়েছে। এখান থেকেই ইচ্ছাপূরণের খেলাটা শুরু হচ্ছে।”

“আমি তো তোমাকে সবক'টা রেভেলেশনই বলেছি রুখসারদি। যা-যা ওর কাছ থেকে জানতে পেরেছি, যা খুঁজে পেয়েছি, সব। কিছু কি করার নেই?”

“ঋত্বিকের কেসটা ইউনিক, তা আমি বলব না। কিন্তু খুব কমপ্লিকেটেড। অনেক সময়ে ট্রমায় আরও আঘাত করলে একটা লাভ হয়, কিন্তু ওর ব্যাপারে সেটাও হবে না। রাদার স্মৃতির মধ্যে যেগুলো ব্রাইট, সেগুলোয় বাইরে থেকে আলো ফেললে একটা কাজ হতে পারে।”

“সেটা হবে কীভাবে?”

“আমি একটা জিনিস ভেবেছি। এখন দেখো তোমাদের পক্ষে যদি সম্ভব হয়।”

“কী সেটা?”

এরপর রুখসার একটু এগিয়ে এসে শর্মিলাকে কিছু একটা বলতে থাকলেন, যখন বাইরে সিগন্যালে দাঁড়িয়ে থাকা অ্যাম্বুলেন্সের হুটারের আওয়াজে ঢেকে গেল সব কথা আর মাথার উপর দিয়ে উড়ে যেতে থাকল আরও-আরও প্লেন। কলকাতায় সাধারণ শীতের একটা সন্ধে নেমে এল এসবের মধ্যেই।

১৯

ওভের-স্যুর-ওয়াজ়, ফ্রান্স
২০ মে, ১৮৯০

গ্রীষ্মেরও আছে এক ধরনের ছদ্মবেশ
যা তোমাকে পথ চিনিয়ে নিয়ে আসতে পারে সহজেই।
যখন বাতাসেও আর বিশ্বাস থাকছে না পথিকের
যখন গাছের ডালে আর এসে বসছে না আগের মতো রোদ,
যখন মেঘের মধ্যেও বাকি নেই আর তেমন ভাসমানতা
তখনও, হ্যাঁ এমনকী তখনও
পথ চলে আসতে পারে সামনে।
তোমার নেহাত সাদামাটা চেহারায় সে ফুটিয়ে তুলতে পারে
ভরসার হাসি।
যখন তুমি আর এগোতেই চাইছিলে না সামনে।
একটা জানলা, একটা নুড়িফেলা রাস্তা, একটা নামিয়ে রাখা টুপি
আর একটা ছিমছাম গ্রীষ্ম
কত কী যে বদলে দিতে পারে,
জানোই না তুমি।

শহরতলির ছোট্ট আর নিরিবিলি স্টেশনটায় যখন ট্রেন থেকে নেমে দাঁড়ালেন ভিনসেন্ট, তখন প্ল্যাটফর্মে তিনি একাই। দুটোই মোটে প্ল্যাটফর্ম, আর সারাদিনে তিনবার মোটে যাতায়াত করে ট্রেন। এতই কম যাত্রী এখানে নামেন বা এখান থেকে ওঠেন যে তাঁদের দাঁড়ানো বা অপেক্ষা করার জন্য কোনও ছায়ার ব্যবস্থাও নেই এখানে। ওভের-স্যুর-ওয়াজ়, প্যারিস থেকে ঘণ্টাখানেক দূরে একটি ছোট্ট বসতিই বলা যায় তাকে। দুপুর-দুপুর এসে সেখানে নেমেছেন ভিনসেন্ট। মে মাস হলেও, হাওয়া তার শীতলতা ভুলে যায়নি এখনও। তাই তিনি পরে আছেন জুতো, ট্রাউজার, একটি বহুব্যবহৃত কোট ও মাথায় বসে থাকা

টুপি, যা তাঁর অত্যন্ত প্রিয়। হাতে একটা সুটকেস আর গোটানো বিছানা তো ছিলই, সেইসঙ্গে বগলের নীচে শক্ত করে বাঁধা নতুন দুটো ক্যানভাস আর রং-তুলির ব্যাগখানা। এই সবই প্ল্যাটফর্মের মেঝেয় নামিয়ে নিজের প্রিয় পাইপটি ধরালেন ভিনসেন্ট। এই পাঁচ মিনিটেই জায়গাটা ভারী ভাল লাগতে শুরু করেছে তাঁর।

প্যারিসে থাকবেন আবার, এমনটা যে একবারও ভাবেননি, তা নয়। আর সে কথা বললে থিও আর জো যে তাঁকে পরম যত্নে নিয়ে গিয়ে রাখত, অথবা ব্যবস্থা করে দিত কোনও সস্তা অথচ ভাল ঠিকানার, এ বিষয়ে তিনি নিশ্চিত। কিন্তু ভাল থাকতে গেলে তাঁর দরকার কেবল কাজ, এ কথা তিনি বিলক্ষণ বুঝতে পেরে গিয়েছেন। অ্যাসাইলামের ডাক্তাররা তাঁকে হাজার ওষুধ খাইয়ে যে-শান্তি দিতে পারেন না, একটা ভাল ছবি তাঁকে তার দশ গুণ শান্তি এনে দেয়। যখন কাজ করছেন না তিনি, তখন নিজেকেই, আর নিজের চারপাশের সব কিছুকে দুঃসহ রকমের খারাপ লাগতে শুরু করতে থাকে। নিজেকে ভয় পেতে থাকেন ভিনসেন্ট, নিজেই। কিন্তু যেই একটা চৌকোনা সাদা কাগজের উপর নিজের ভাবনাগুলো নিজেরই হাতে ফুটে উঠতে দেখেন, মনে হয় স্বর্গেই বাস করছেন নিশ্চিত, এই পৃথিবীর চাইতে ভাল আর কিছুই যেন হতে পারে না।

এই অভিজ্ঞতা তাঁর এতবার হয়েছে যে তিনি জানেন, আঁকা, আর কেবলমাত্র এঁকে চলাই তাঁর সেরা পথ্য। প্রবল গতিতে এঁকে ফেলতে হবে তাঁকে অনেক-অনেক ছবি। থামলে চলবে না। আর ছবি যদি আঁকতেই হয়, যা বুঝেছেন ভিনসেন্ট, তাঁর থাকা দরকার বড় শহর থেকে দূরে, যেখানে জীবন আর মানুষ, দুটোই প্রকৃতির অনেক বেশি কাছাকাছি।

প্যারিস তাঁকে নিঃসন্দেহে অনেক কিছু শিখিয়েছে। কিন্তু সম্ভ্রান্তদের ওই অতিকায় শহরে শেষমেশ দম আটকেই আসতে থাকে ভিনসেন্টের। আঁকার বিষয় খুঁজে পান না তিনি। তার চাইতে ফ্রান্সের এই ছোট-ছোট শহরতলিগুলি ভারী মনোরম মনে হয় তাঁর। কাজ করার জন্য সবচেয়ে উপযোগী। অল্প মানুষ, কয়েক ঘর বাসিন্দা, আর সেইসঙ্গে মাঠঘাট, খেত খামার আর ব্যাপ্ত আকাশ ও গাছের সারি। এমনটা না হলে একজন শিল্পী আঁকবেন কী করে? তাই অনেক ভেবে ওভের-স্যুর-ওয়াজ়কেই বেছে নিলেন ভিনসেন্ট। প্যারিস থেকে বেশি দূরও নয়, চাইলে তিনি বা থিও আরামেই যাতায়াত করতে পারবেন, আবার একইসঙ্গে প্রকৃতির শোভাও চোখ জুড়িয়ে দেওয়ার মতো। সবই ঠিক, কিন্তু আপাতত একটি থাকার মতো আস্তানা জুটিয়ে নিতে হবে তাঁকে, আর সেটি এই ছিমছাম রেলওয়ে স্টেশনের কাছাকাছি হলে বড়ই ভাল হয়। ধূমপান শেষ করে বাক্স-পত্র হাতে নিয়ে স্টেশন থেকে বেরিয়ে এলেন ভিনসেন্ট।

বেরিয়েই দেখলেন, সরু রাস্তা চলে গিয়েছে দু'দিকে। ডাইনে থেকে বাঁয়ে বেশ ঢালু হয়েই নেমেছে সেই পথ। রাস্তার এ ধারে স্টেশন, তার পাশে খুচরো খালি জমি কিছু, আর মাঠ। ওধারে একের পর এক সার বাঁধা একতলা দোতলা বাড়িঘর। বেশিরভাগেরই একতলায় কিছু না কিছু দোকান, স্থানীয় বাসিন্দাদের অনেকেই ছোট দোকান চালিয়ে রোজগার করে থাকেন এইসব এলাকায়। ভিনসেন্ট এখানে দাঁড়িয়েই দেখতে পেলেন একখানা সালঁ, একটি ছোট রেস্তোরাঁ, আর একটি বেশ জমজমাট পাতিসেরি। দুপুরের রোদে সেই দোকান থেকে ভেসে আসছে তপ্ত বেকিং-এর নরম গন্ধ। খিদের কথা মনে পড়ে গেল ভিনসেন্টের, কিন্তু তার আগে ঠিকানা দরকার। নিভৃত, নির্জন একটা ঘর হলেই চলে যাবে তাঁর, যেখানে তিনি নিশ্চিন্তে কাজ করে যেতে পারবেন চাইলেই।

বাঁ দিকটা ধরেই হাঁটা লাগালেন ভিনসেন্ট, কারণ এত জিনিসপত্র নিয়ে চড়াইয়ে ওঠা ভারী ঝামেলারই হবে। সামনেই পাওয়া গেল এক ছোকরাকে, রাস্তার কল সারাই করছিল সে।

"ভাই, এখানে সস্তায় থাকার জায়গা পাওয়া যাচ্ছে কি কোথাও?" নরম স্বরেই জানতে চাইলেন ভিনসেন্ট।

প্রশ্নটি শুনে সেই ছেলে মুখ তুলে একবার ভিনসেন্টের মাথা থেকে পা পর্যন্ত মাপল, এইমাত্র ভিনসেন্ট যে বাইরে থেকে এসে নেমেছেন এখানে, তা আর বলে দিতে হয় না কাউকে।

"তা মসিয়েঁ'র আসা হচ্ছে কোত্থেকে?"

"প্যারিস। এই তো প্যারিস থেকেই আসছি।"

একটু থমকে গিয়ে মিথ্যে কথাটাই বললেন ভিনসেন্ট। বড় শহরের আগন্তুকদের এরা একটু হলেও নেকনজরে দেখে বই কী।

"ঠিক বলতে পারব না, তবে সামনের র‍্যাভো ইন-এ একবার খোঁজ করে দেখতে পারেন", বলে ছোকরা আবার কল সারাইয়ের কাজে মন দিল।

তার কথামতো ভিনসেন্ট আর বিশ-পঁচিশ পা এগোতেই রাস্তার উলটোদিকে দোতলা সেই রেস্তোরাঁর দেখা পেয়ে গেলেন। র‍্যাভো ইন। এই সার বেঁধে দাঁড়িয়ে থাকা বাড়িগুচ্ছর মধ্যে সে একটু আলাদাই বলতে হবে। তার কারণ রেস্তোরাঁর বাইরে, ঠিক শহুরে কেতায় পাতা রয়েছে কয়েক জোড়া টেবিল, যেখানে বেশ কিছু খদ্দের বসে দুপুরের খাওয়া সারছেন এখন, তাঁদের আড্ডায় রাস্তা সরগরম। বাদামি জানলা আর গোলাপি দেওয়ালের এই রেস্তোরাঁবাড়ি শেষ হওয়ার পরেও রাস্তাটা সোজা গিয়েছে কিছুদূর, তারপর বেঁকে গিয়েছে ডাইনে। যেখানে এখন দাঁড়িয়ে বাড়িটার দিকে তাকিয়ে আছেন ভিনসেন্ট, সেখানে তাঁর

পিঠের দিকে দিব্যি একখানা ঢালু মাঠ, আর সামনে, বাড়িঘরের উপরে, যতদূর চোখ যায় ঘন নীল স্বচ্ছ আকাশ। এমন জায়গায় তাঁর কাজ ভারী ভাল হবে। তিনি একরকম নিশ্চিত।

রেস্তোরাঁর দরজার বাইরেই সিগার ধরিয়ে মোটাসোটা চেহারার এক ভদ্রলোক বসে আছেন, হাবভাব দেখে তাঁকেই মালিক বলে মনে হল ভিনসেন্টের। রাস্তা পেরিয়ে গিয়ে দাঁড়ালেন তিনি।

"মসিয়েঁ, আমি একজন শিল্পী, আসছি প্যারিস থেকে। আপনার এখানে থাকবার কোনও ঘর হবে কি?"

ভদ্রলোক উঠে দাঁড়িয়ে করমর্দনের জন্য হাত বাড়িয়ে দিতে একটু অবাকই হলেন ভিনসেন্ট।

"শিল্পী? আচ্ছা? কী নাম আপনার মসিয়েঁ?"

"আজ্ঞে, ভিনসেন্ট। ভিনসেন্ট ভ্যান গঘ।"

"বেশ বেশ। তা কদ্দিনের জন্য চাইছেন ঘর?"

"এখন বেশ কিছুদিন যাচ্ছি না কোথাও। পছন্দ হলে মাস ছয়েক কি বছরখানেকও থেকে যেতে পারি।"

"হুম। শিল্পীদের আমি ভারী পছন্দ করি। কিন্তু কী জানেন, তাঁদের অনেকে আবার অনেক সময়ে পাগলাটে ধরনের হয়ে থাকেন। আপনি আশা করি তেমনটা নন?"

বলেই নিজের কথায় হো-হো করে হেসে উঠলেন ভদ্রলোক। বাইরের টেবিলে তখন হাঁসের মাংস আর সুস্বাদু রুটি ও ওয়াইনের গন্ধ পাচ্ছেন ভিনসেন্ট। কথাটা শোনামাত্র তিনি ভাবলেন, এই সুটকেসের মধ্যে অ্যাসাইলামের কাগজপত্রগুলো রাখা। তাঁর চোখ দেখে কি ভদ্রলোক টের পাচ্ছেন কিছু? নিজেকে আরও বেশি স্বাভাবিক দেখানোর একটা চেষ্টা এনে ভিনসেন্ট বললেন, "না না, আমি নেহাতই নির্ঝঞ্ঝাট মানুষ। একটা ঘর পেলে আমি আঁকা ছাড়া আর কিছুই করতে চাই না, আপনি মিলিয়ে নেবেন।"

"বেশ, চিলেকোঠার ঘরটা খালি আছে। একটু ছোট, একটা বিছানা আর একটা চেয়ার আছে সেখানে, সেইসঙ্গে একটা জানলা। কিন্তু হ্যাঁ, আলো-হাওয়া খেলে ভাল। আপনি একবার দেখে নিন, পছন্দ হলে ব্যবস্থা করা যাবে।"

ঘর আছে শুনে হাঁফ ছেড়ে বাঁচলেন ভিনসেন্ট। এমন জায়গায় আস্তানা না পেয়ে ফিরে গেলে ভারী মনখারাপ হত তাঁর।

"অ্যাডেলিন!"

বেশ জোরে হাঁক পাড়লেন ভদ্রলোক। রেস্তোরাঁর ভিতর থেকে বেরিয়ে এল সাদা লেসের ফ্রক পরা ফুটফুটে একটি মেয়ে। সে এখুনি কোনও একটা দুষ্টুমি ঘটিয়ে এসেছে, যার হাসি সে এখনও মুছে উঠতে পারেনি তার লাল টুকটুকে ঠোঁট থেকে।

"ইনি মসিয়েঁ ভিনসেন্ট। এঁকে সঙ্গে করে নিয়ে গিয়ে চিলেকোঠার ঘরখানা একবার দেখিয়ে নিয়ে এসো তো..."

মেয়েটি যেভাবে বাধ্য হয়ে মাথা নাড়ল, তাতে ভিনসেন্ট বুঝলেন, এ কাজ তাকে প্রায়শই করে থাকতে হয়।

ফুটফুটে সেই অ্যাডেলিনের পিছন-পিছন রেস্তোরাঁর টেবিল-চেয়ারের ভিড় পেরিয়ে সরু একটা সিঁড়ি বেয়ে উঠে গেলেন ভিনসেন্ট। ভদ্রলোক ভুল কিছু বলেননি, ঘরটি সত্যিই ছোট। এক কোণে একটা ফালি বিছানা, লোহার খাটের উপর। বেশ পরিষ্কারই বলতে হবে। আর দেওয়াল ঘেঁষে, দরজার ঠিক পাশটাতে একটা জীর্ণ কাঠের চেয়ার। এ ছাড়া মাথার ধারে একটা ছোট তেপায়া আছে বটে, যার উপর এখন একটা জলের গামলা রাখা আছে। আর আছে দেওয়ালের গায়ে পোড় খাওয়া একটি আয়না। মাথার উপর চৌকো ফালি করে জানলার পাল্লা লাগানো। জানলার কাচ দিয়ে আকাশ, কেবল ঘন নীল আকাশ ছাড়া আর কিছুই দেখা যাচ্ছে না। একবার দাঁড়িয়েই ঘরখানা দিব্যি পছন্দ হয়ে গেল ভিনসেন্টের। এখানে বেশ মন দিয়ে কাজ করা যাবে বলেই তাঁর ধারণা।

জিনিসপত্র নামিয়ে রেখে নীচে নেমে আসছেন যখন, অ্যাডেলিন নরম আওয়াজে জিগ্যেস করল, "তুমি ছবি আঁকো?"

সে এতক্ষণ ভারী কৌতূহলী দৃষ্টিতে তাকিয়ে ছিল ভিনসেন্টের আঁকার সরঞ্জামের দিকে। এমন মানুষ সে আগে দেখেনি এখানে।

"হ্যাঁ, আমি ছবি আঁকি। তুমি আঁকো না?"

"উঁহু, আমার কেবল খেলতে ভাল লাগে" নিপাট জবাব অ্যাডেলিনের। তারপর সে বলল, "আচ্ছা, তুমি কি আমার ছবি এঁকে দেবে?"

প্রশ্নটা শুনে একটু হাসলেন ভিনসেন্ট, "নিশ্চয়ই দেব। কিন্তু তোমাকে চুপটি করে বসে থাকতে হবে সারাদিন। পারবে তো?"

উত্তরে বাধ্য মেয়ের মতোই মাথা নেড়ে ছুটে বাইরে বেরিয়ে গেল অ্যাডেলিন।

ঘর পছন্দ হয়েছে ভিনসেন্টের, আর ভিনসেন্টকেও মনে ধরেছে সরাইখানার মালিকের। এখন ভাড়ায় পোষালেই আর কোনও চিন্তা থাকে না। শেষমেশ দিনপিছু সাড়ে তিন ফ্রাঁ-এ রফা হল ঘরভাড়া। খুব যে বেশি, তা বলা চলে না। সেই সঙ্গে অবশ্য খাবারের দামও ধরা আছে। যেদিন যেমন রান্না হবে রেস্তোরাঁয়, তারই এক প্লেট পৌঁছে দেওয়া হবে দু'বেলা,

ভিনসেন্টের চিলেকোঠার ঘরে। এর চাইতে ভাল আর কী হতে পারে? বহুদিন পর, এই মে মাসের ফুরফুরে দুপুরবেলায়, মনটা ভাল হয়ে গেল ভিনসেন্টের। বাইরের একটা টেবিল খালি পেয়ে তিনি এক কাপ কফি আর একটা বান অর্ডার করলেন। অ্যাডেলিন তখন উলটোদিকের মাঠটায় দেদার ছোটাছুটি করছে, একটি প্রজাপতির পিছন-পিছন।

২০

ম্যানহ্যাট্‌ন ওয়েস্ট, নিউ ইয়র্ক
২০ ডিসেম্বর, ২০১৭

নির্বাসন থেকে ছুটিকে আলাদা করবার যন্ত্র এসেছে বাজারে।
দরদামে মিলতে পারে সস্তায়, কিন্তু হে পথিক
দাঁড়াবার সময় পেলে না তুমি
পেলে না উড়তে উড়তে নীচে তাকানোর সময়ও।
পেলে দেখতে হাওয়া বয়ে নিয়ে যাচ্ছে
ঝাঁকের পর ঝাঁক প্রাণ, প্রাণপিণ্ড
মাটির ওপর দিয়ে, জলের ওপর দিয়ে, কয়লা আর অরণ্যের ওপর দিয়ে
ভ্রাম্যমাণ এই জীবন, যা কেবল আকাশ থেকে দেখা যায়,
সেখানে স্বাগত তোমাকেও।
চড়ুইভাতির সঙ্গে বিচ্ছেদের তফাত বোঝাতে এসেছে এক হাত
সেখান থেকে রুমালটা সরিয়ে নাও।

ঠান্ডার কথা আগেই জানা ছিল ভালভাবে, তাই শর্মিলা আর ঋত্বিক, দু'জনেরই সুটকেস ভরতি বেশির ভাগই শীতপোশাক। বিমানবন্দরে নামামাত্র অবশ্য তাপমাত্রার ফারাকটা টের পাওয়া গেল। কাঁধের ব্যাগ থেকেই দুটো পুলওভার বের করে গায়ে চাপিয়ে নিতে হল। কলকাতার শীতের সঙ্গে নিউ ইয়র্কের ডিসেম্বরের কোনও তুলনাই হয় না। দরজা ঠেলে ট্রলি নিয়ে যখন ক্যাব নেবে বলে বাইরে বেরোল দু'জন, চারপাশ তখন ধবধবে সাদা। বরফে। রাস্তার দু'পাশে অন্তত তিন ফুট বরফ জমে আছে, আর রাস্তা ভেজা-ভেজা। প্রতি বছর যদিও এ সময়ে এখানে বরফ পড়ে না, তবে এ বছর ভালরকম তুষারপাত হচ্ছে দিনকয়েক ধরেই। হাওয়া বইছে সাদা রঙের, যা চাইলে কাঁপিয়ে দিতে পারে হাড়।

সামনেই বড়দিন, তাই এ সময়ে লোকজনের ভিড় বড্ড বেশি। বহু মানুষ বাড়ি ফিরছেন, আবার অনেকে নিউ ইয়র্কের ক্রিসমাসের অভিজ্ঞতা নেওয়ার জন্য অন্যান্য প্রদেশ

বা দেশ থেকে উড়ে আসছেন। মোট কথা, ক্যাবের লাইন বেশ দীর্ঘ।

শর্মিলা একবার চেপে ধরল ঋত্বিকের হাত। দুটো হাতই ঠান্ডা ছিল, তারা এবার উত্তাপ পাওয়ার একটা মাধ্যম পেল। ঋত্বিক এখনও ঠিক সত্যি-সত্যি ভেবে উঠতেই পারছে না যে শর্মিলা, যাকে নাকি সে এত বছর ধরে চেনে এবং বেশ ঠান্ডা মাথার হিসেবি বিচক্ষণ মানুষ বলেই জানে... সে... হ্যাঁ, সে-ই এই আজব কাণ্ডখানা একা হাতে দায়িত্ব নিয়ে ঘটিয়ে ফেলল! এই ঠান্ডা হাওয়ার মধ্যে, নিশ্বাস থেকে সাদা ধোঁয়া ছাড়তে-ছাড়তে ক্যাবের লাইনে দাঁড়িয়ে সেই বিস্ময় নিয়েই আরও একবার ভাবছিল ঋত্বিক।

কত তারিখ হবে সেটা? ১০ তারিখ মতো, ডিসেম্বরের? রাতে শর্মিলাই ঠিক করল বাইরে খেতে যাবে। বহুদিন ডাইন আউট করা হয় না। পছন্দের একটা কন্টিনেন্টাল কুইজিনের রেস্তোরাঁয় যখন সবে বেক্‌ড ফিশে কাঁটা গেঁথেছে ঋত্বিক, তখনই ঘটনাটা ঘটল।

"এই যে, সারপ্রাইজ়-সারপ্রাইজ়!"

ঋত্বিক কাঁটা প্লেটে নামিয়ে রেখেই চোখ তুলে দেখল শর্মিলার হাতে একটা প্রিন্ট আউট, "এটা কী?"

"আহা, পড়েই দ্যাখো না..."

"সিসিইউ টু জেএফকে টোয়েন্টিয়েথ ডিসেম্বর... মানে? এটা কী করেছ?"

"কী আবার করব! সারপ্রাইজ়!"

"এ কী কাণ্ড শর্মিলা! তুমি এরকম দুম করে নিউ ইয়র্ক যাবার টিকিট কেটে বসলে? মানেটা কী? এ তো প্রচুর টাকা দাম নিয়েছে দেখছি। হঠাৎ? দশ দিনের ট্রিপ... তুমি এতগুলো ছুটি নিয়েছ এর মধ্যেই। তারপর... ওখানে থাকা খাওয়া... আই মিন... কেন?"

"দ্য স্টারি নাইট, মাই ডিয়ার হাজ়ব্যান্ড।"

শর্মিলার মুখে সেই হাসিটাই ছিল, যেটা সম্ভবত নিজের অসুস্থতার কারণেই, দীর্ঘদিন দেখতে পায়নি ঋত্বিক।

"দ্য স্টারি নাইট?"

"দ্য স্টারি নাইট।"

"মানে?"

"ভুলে গেছ? দ্য স্টারি নাইট কোথায় আছে? মিউজ়িয়াম অফ মডার্ন আর্টস, নিউ ইয়র্ক। মোমা। মনে পড়ছে? চলো এবার দু'জন মিলে দ্য স্টারি নাইট দেখে আসি। যাবে না?"

এর উত্তরে অনেকক্ষণ কিছু বলতেই পারেনি ঋত্বিক, কারণ তার বিশ্বাস হচ্ছিল না শর্মিলা এই পাগলামিটা তার জন্য করছে। এখন এই ক্যাবের লাইনে দাঁড়িয়েও তার অবিশ্বাসের ঘোর কাটতে চাইছে না কিছুতেই।

"কিন্তু ওখানে থাকব কোথায়?"

মাছের একটা টুকরো কোনও রকমে খেয়ে, হুইস্কির গ্লাসে একটা চুমুক দিয়ে ধাতস্থ হয়ে প্রশ্নটা করেছিল ঋত্বিক। ততক্ষণে তার বিস্ময়ে চেঁচিয়ে ওঠায় বেশ এক-দু'জন খদ্দের ঘাড় ঘুরিয়ে তাকিয়ে ফেলেছেন।

"হোটেলে তো থাকতে পারব না, প্রশ্নই নেই। সহেলিদি-মৈনাকদাদের নতুন অ্যাপার্টমেন্টে গিয়ে থাকব। কথা হয়ে গিয়েছে।"

সহেলিদি আর মৈনাকদা তাদের দীর্ঘদিনের চেনা, আর সে-ও অদ্ভুতভাবেই। শেষ যেবার মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র যাচ্ছিল ঋত্বিক, বছর দশেক আগে, অফিসের একটা প্রেজেন্টেশন নিয়ে, শিকাগো ওহেয়ার বিমানবন্দরে সহেলি আর মৈনাকের সঙ্গে আলাপ হয় ওর। ঋত্বিক যাবে শিকাগো সিটি অফিস, সহেলি আর মৈনাক কোথাও থেকে আবার নিউ ইয়র্কে নিজেদের ডেরায় ফিরছে। পাবলিক ফোনের খুচরো দেওয়ার ব্যাপারে ওরা সাহায্য করেছিল ঋত্বিককে। সামান্য ব্যাপার। কিন্তু ঋত্বিকের মনে আছে, সেদিন বিমানবন্দরেই দেদার আড্ডা হয়েছিল। সহেলিদি কথা বলতে ভীষণ ভালবাসে, আর মৈনাকদাও ভারী মিশুকে। ওই এক আলাপেই তারা তাদের ম্যানহ্যাট্‌নের বাসায় গিয়ে থাকার আবদার জানিয়ে রেখেছিল। ঋত্বিক বা শর্মিলার আর মার্কিন দেশে যাওয়া হয়নি ঠিকই, কিন্তু সহেলি বা মৈনাক কলকাতায় এলেই ওদের বাড়িতে আসে-যায়, আড্ডাও হয় দারুণ। বয়সে ওদের দু'জনের চেয়ে কিছু বড় সহেলি আর মৈনাক এখন ব্যাঙ্কার। বেশ প্রতিষ্ঠিত ব্যাঙ্কারই বলতে হয়। যদিও দু'জনেই আগে বিশ্ববিদ্যালয়ে অর্থনীতি পড়াত। ত্রিশ বছর আগে দেশ ছেড়েছে, পঁচিশ বছর ধরে একসঙ্গে আছে। দারুণ জুটি। আর এই দশ বছরের আলাপে ওরা ঋত্বিক আর শর্মিলার নিজের দাদা-দিদির মতো হয়ে গিয়েছে। কিন্তু তবু ঋত্বিকের মধ্যে একটা দ্বিধা কাজ করছিল। তার এই অসুস্থতা নিয়ে এইরকম উৎসবের মরশুমে সহেলিদি-মৈনাকদাকে বিরক্ত করাটা কি উচিত কাজ হবে?

"কথা হয়ে গিয়েছে বুঝলাম, কিন্তু ওদের অসুবিধে হবে না? আমার তো শরীর ভাল যাচ্ছে না।"

"তোমাকে বলা হয়নি, ওরা একটা নতুন পেন্ট হাউজ় কিনেছে, হাডসনের ঠিক পাশটাতেই। সেখানেই থাকব আমরা, কিন্তু ওরা থাকছে না। ক্যালিফোর্নিয়ায় মৈনাকদার বোন থাকে, তার বিয়ে অ্যাটেন্ড করতে যাচ্ছে। ইন ফ্যাক্ট, চলেও গিয়েছে। সেখান থেকে

বেড়াতে যাওয়ার প্ল্যান আছে ওদের। কিন্তু পেন্ট হাউজের চাবি থাকবে সিকিউরিটির কাছে, আমাদের আইডি দেখিয়ে ঢুকে যেতে হবে, ব্যস! ক'টা দিন নিজেদের মতো করে কাটানো যাবে। আর তুমি তো জানো, নিউ ইয়র্কে থাকলে বাজার-হাট করে রেঁধে-বেড়ে খাওয়াটাও কোনও ব্যাপার নয়। কী, বুঝলে এবার?"

সেই ডিনারের টেবিল আর আজকের ক্যাবের লাইন। কেমন ঝট করে সব কিছু ঘটে গেল! ভাবতে-ভাবতেই সুটকেস দুটো পিছনে তুলে দিয়ে হলদে একটা ক্যাবে চড়ে বসল ঋত্বিক আর শর্মিলা।

"ওয়েস্ট এন্ড অ্যাভেনিউ।"

শর্মিলার গলা একটু ধরে গিয়েছে, ঠান্ডাতেই হবে নিশ্চয়ই।

নিউ ইয়র্ক আগে আসেনি দু'জনের কেউই। ঋত্বিক আগের বার শিকাগো থেকেই ফিরে গিয়েছিল কলকাতায়। তাই পৃথিবীর এই বিস্ময়কর শহরটা দেখা হয়নি তার। ক্যাবটা যখন বিমানবন্দর এলাকা ছাড়িয়ে ম্যানহ্যাট্‌নের মূল রাস্তায় ঢুকছে, শর্মিলা আর ঋত্বিকের মুখ যার-যার জানলায় সাঁটা, আর দু'জনের চিবুক ঊর্ধ্বমুখী।

সামনে বড়দিন বলেই বোধহয় এই তুমুল শীতেও রাস্তায় লোকজনের কোনও অভাব নেই, যেমনটাই নিউ ইয়র্কে হওয়ার কথা, আর চারপাশ সেজে উঠেছে রং-বেরঙের সরঞ্জামে। গোটা শহরটার মধ্যে যে এক উৎসবের প্রাণতরঙ্গ বয়ে যাচ্ছে সারাক্ষণ, শীতের কনকনে বাতাসের চাইতেও যার জোর বেশি, সে আর বলে দিতে হয় না কাউকে।

ওয়েস্ট এন্ড অ্যাভেনিউ পৌঁছোতে ওদের আধঘণ্টা মতো লাগল। সেই রাস্তার উপরেই একটা পেল্লায় বাড়ির দরজা ঠেলে ঢুকে গেল দু'জনে। বাইরের তাপমাত্রা তখন শূন্যের একটু নীচেই হবে। সামনে নদী বলেই হয়তো এখানে হাওয়ার প্রকোপ আরও বেশি করে টের পাওয়া যাচ্ছে।

চাবি নিয়ে উপরে, পঁয়ত্রিশ তলায় উঠে এসে এক্কেবারে বাঁদিকে সরু দরজাটা খুলে একটা অন্য পৃথিবীতে ঢুকে পড়ল শর্মিলা আর ঋত্বিক। একটা ছোট্ট করিডর, যেখানে জুতো রাখার ব্যবস্থা আর দু'-একটা আর্টিফ্যাক্টস সাজানো, সেইটা পেরিয়ে গিয়েই মস্ত বড় একটা হল। তাদের বিস্ময়ের চোটে ঢোকার দরজাখানা হাট করে খোলাই থাকল।

হলের তিনদিকের দেওয়াল তৈরি কাচ দিয়ে। লম্বা আর চওড়া কাচ সব। আর সেই কাচের ওপারে মাথা উঁচু করে দাঁড়িয়ে আছে একটা ঝকঝকে শহর, যার বহুদূর পর্যন্ত এই এখান থেকে দাঁড়িয়েই দেখতে পাচ্ছে দু'জনে। ডান দিকে তাকালে, একটু দূরেই হাডসন বয়ে যাচ্ছে নির্লিপ্তভাবে, তার এপাশে শুরু হচ্ছে নানা আকৃতি, রং আর ধরনের হাইরাইজ,

যাদের গুনেও শেষ করা যাবে না। আর সবকিছুর উপরে ম্যানহ্যাটনের নীল অথচ অল্প ধোঁয়াটে আকাশ।

দু'জনেই দাঁড়িয়ে থাকল অনেকক্ষণ। ঘরভরতি নানা র‍্যাকে অগুনতি বই সাজানো, দেখেই মন ভাল হয়ে যেতে বাধ্য। আর আছে একখানা মিউজ়িক প্লেয়ার। বেশ কিছুক্ষণ ঘুরে-ঘুরে অবাক হয়ে চারপাশ দেখল দু'জনেই। তারপর শর্মিলা বাঁ দিকের রান্নাঘরে ঢুকল। ফ্রিজের দরজায় অন্তত ডজন খানেক পোস্ট-ইট, তাতে সহেলিদির হাতে লিখে রাখা নানা জরুরি জিনিস, যাতে শর্মিলাদের কোনও ভাবেই কোনও অসুবিধে না হয়। পাশেই কফি মেকার। দু'কাপ কড়া কালো কফির এখন ভারী দরকার দু'জনেরই। তারপর স্নান-খাওয়া করা যাবে।

শর্মিলা যখন কফি চাপাচ্ছে মেশিনে, তখন ঋত্বিক একটা কাচের পাল্লা ঠেলে গিয়ে দাঁড়াচ্ছে এক চিলতে চৌকোনা বারান্দায়, যেখানে ডিসেম্বরের হাওয়া ঝমঝম করছে সারাক্ষণ। রোদও পড়েছে অবশ্য, বেশ আরামেরই একখানা রোদ আজ এখানে। সেইসঙ্গে বারান্দার মেঝেতে অন্তত এক ফুট গভীর বরফের লেপ। সেই লেপে পা ডুবিয়েই দাঁড়াল ঋত্বিক, যখন হাইরাইজ়গুলোর কাচে রোদ্দুর পড়ে এক ধরনের শহুরে ক্যালাইডোস্কোপ তৈরি হয়েছে, আর দূরে ডানদিকে, হাডসনের জল চিকচিক করছে। সেখানে একটা জাহাজ, একটাই, মিলিয়ে যাচ্ছে দূরের দিকে।

ঋত্বিক চুপচাপ ওই প্রবল হাওয়ার মধ্যেই দাঁড়িয়ে থাকল।

২১

মিউজ়িয়াম অফ মডার্ন আর্টস, নিউ ইয়র্ক
২৩ ডিসেম্বর, ২০১৭

মাঝারি মাপের চৌকোনা বাড়িটার সামনে ক্যাব থেকে যখন ঋত্বিক আর শর্মিলা নামল, সকালের ঘড়িতে তখন বাজে সাড়ে দশটা আর হাওয়া বইছে হু-হু করে। ঠিক এমন ধরনের হাওয়া কলকাতার শীতে কোনও দিন টের পায়নি ওরা। পেতে হয়নি কখনও। এখন, এই ক্যাব থেকে নেমে ফুটপাথের দিকে এগোনোর সময়ে এক মুহূর্তের জন্যে ঋত্বিকের মনে হল, সে আশ্চর্য ভাবে জমে যাচ্ছে ঠান্ডায়। সে আজ পরে আছে একটা সোয়েটার, মেরুন রঙের, তার সঙ্গে বাদামি ট্রাউজার। এই পরেই সে বেরিয়ে আসত তাদের অ্যাপার্টমেন্ট থেকে, যদি না খেয়াল করে শর্মিলা তাকে একটা টুপি আর ওভারকোট পরতে বলত। দুটোই অবশ্য মৈনাকদার রেখে যাওয়া, কিন্তু দিব্যি এঁটে গিয়েছে ঋত্বিকের গায়ে। শৈত্যপ্রবাহ যে থাকবেই, এমনটা বলা হচ্ছিল গত হপ্তা থেকেই, রেডিয়ো এবং টিভিতে। এ সময়টা এরকমই হওয়ার কথা। শর্মিলা আজ নিজেও পরেছে ডেনিমের উপর সোয়েটার আর লাগসই একখানা জ্যাকেট। সঙ্গে উলের টুপি তাকে ভারী মানিয়েছে। নিউ ইয়র্কের রাস্তা-ঘাটে এখন দেদার বরফ, যেমনটা তাদের জানলা আর বারান্দা থেকেই দেখা যাচ্ছে। ঋত্বিকরা ছোটবেলায় মেঝের উপর তুলো বিছিয়ে বরফ তৈরি করত, ঝুলনে। প্রায় সেইরকমই দেখতে লাগছে এখন। বরফ কেটে-কেটে ভোরবেলা তৈরি হয়েছে রাস্তা, আর তা দিয়েই রোজকার মতো যাতায়াত করছে ছোট-বড় গাড়ির ঝাঁক। তবে কিনা কাজ-কাজ ভাবের চাইতে ছুটি-ছুটি ভাবই যে বেশি, তা আর বলে দিতে হয় না। কাল বাদে পরশুই তো বড়দিন!

ছোট্ট একখানা রাস্তা, যাকে এদের ঠিকানার ভাষায় স্ট্রিট বলে। আর সামনে আড়াআড়ি বয়ে যাওয়া চওড়া রাস্তাখানা হল গিয়ে অ্যাভেনিউ, ঋত্বিক আর শর্মিলা দু'জনেই এখন এই অঙ্ক দিব্যি বুঝে গিয়েছে, ফলে তাদের চলাফেরাও হয়েছে সোজা।

ছোট রাস্তা আর লম্বা লম্বা বাড়ি বলেই ঠান্ডা হাওয়াটা আরও পেয়ে বসেছে এখানে। দাঁড়িয়ে এক কাপ কফি খেয়ে নেওয়ার মতলব এঁটেছিল ঋত্বিক, কিন্তু সেটা করা সমীচীন

হবে না বলেই তাড়াতাড়ি পা চালিয়ে ঢুকে পড়ল মিউজিয়ামে। গোটা রাস্তা সে কেবল এ কথাই ভাবতে-ভাবতে এসেছে যে এমন একখানা দিন কতই না অবিশ্বাস্য, যেদিন সে সত্যি-সত্যি 'দ্য স্টারি নাইট'-এর সামনে গিয়ে দাঁড়াচ্ছে। অবশ্য সত্যিই কি দাঁড়াচ্ছে আজই? এর আগে জেগে থেকেই যে কত-কতবার দেখেছে এই ক্যানভাসটা, সেসব দেখা কি মিথ্যে? আবারও গুলিয়ে যায় ঋত্বিকের। সে শর্মিলাকে লুকিয়ে নিজের হাত জোরে চেপে ধরে নিজেকে বিশ্বাস করাতে চায় যে আজকের এই দেখতে আসাটা হ্যালুসিনেশন নয়। এমনকী কল্পনাও নয়। এটা ঘোর বাস্তব, যা আজ তার সঙ্গে ঘটছে। কিন্তু ঋত্বিক এই লাউঞ্জে দাঁড়িয়েও আর বিশেষ কিছু ভাবতে পারছে না। ঘোর বাস্তব যে এত বেশি করে অবাস্তব মনে হতে পারে, এটা ভেবে নিজেরও আজ ভাল লাগছে তার।

বড়দিনের আগেভাগেই বলে কি না কে জানে, মানুষের ভিড় আজ খুব বেশি একটা দেখা যাচ্ছে না এখানে। নইলে সহেলিদি যেরকম বলেছিল, তাতে টিকিট পেতেই ঘণ্টা আধেক অন্তত লাগার কথা। অডিও গাইড না নিলেও, একটা ফ্লোর প্ল্যান নিতেই হয়েছে শর্মিলাকে, নইলে এত বড় মিউজিয়ামে কোথায় কী আছে সেটা খুঁজে বার করতেই বেলা গড়িয়ে যেতে পারে। এবং শর্মিলা মিনিটখানেকের চেষ্টায় বুঝতে পারল, তাদের সটান চলে যাওয়া উচিত ফিফ্‌থ ফ্লোর-এ। প্রত্যেক ফ্লোরেই গুরুত্বপূর্ণ কাজ রয়েছে, সময়ের বিচারে সেগুলো ভাগ করেই এক-এক তলায় সাজানো। কিন্তু এই ঠান্ডায় আজ বেশিক্ষণ ঋত্বিককে নিয়ে বাইরে থাকার ইচ্ছে নেই তার। তা ছাড়া ওর যা মনের অবস্থা, ওই একটি ছবি ওকে আগে দেখিয়ে ফেলা দরকার।

পাঁচ নম্বর ফ্লোরে এলিভেটর থেকে বেরিয়েই ডানদিকে একটা দেওয়াল, আর তার গায়ে ভিতরে যাওয়ার রাস্তা। এই দেওয়ালের গায়েও বিশাল একটি ক্যানভাস টাঙানো আছে, কিন্তু সেদিকে গেল না শর্মিলা। সে ঋত্বিকের কনুই হাতে জড়িয়ে নিয়ে সটান ঢুকে গেল ঘরটায়, আর তারপর ছেড়ে দিল ঋত্বিকের হাত। কারণ তারা যেখানে দাঁড়িয়ে আছে, তার দশ মিটারের মধ্যে, ঘরের ঠিক মাঝখানটায় একখানা চৌকোনা দেওয়াল। দেওয়ালের এদিক থেকেই দেখা যাচ্ছে যে তার ওপাশে, এমন বরফের বিচ্ছিরি দিনেও জড়ো হয়েছেন অসংখ্য মানুষ, আর দেওয়ালের দিকে তাকিয়ে তাঁদের বিস্ময় প্রকাশ করছেন। কালো সুট পরা এক গম্ভীর ব্যক্তিও দাঁড়িয়ে আছেন দেওয়াল ঘেঁষে, তিনিই পাহারা দিচ্ছেন ভিনসেন্ট ভ্যান গঘের অন্যতম বিখ্যাত ক্যানভাস, 'দ্য স্টারি নাইট'।

"যাও, আমি এখানে আছি," বলে আলতো করে ঋত্বিকের হাত ছেড়ে দিল শর্মিলা। ঋত্বিক আধাবিশ্বাসী পায়ে যখন এগিয়ে যাচ্ছে দেওয়ালের ওপাশে, তখন লোকের ভিড় আরও বাড়ছে ছবিটার সামনে। সে-ও গিয়ে ভিড়ের একজন হয়ে দাঁড়াল, ছবিটার সামনে।

দ্য স্টারি নাইটের সামনে। স্বপ্নের ক্যানভাসের মুখোমুখি, যেখানে কথামতোই ঘুমিয়ে রয়েছে রাতের গ্রাম, যাকে পাহারা দিচ্ছে বনস্পতি সাইপ্রেস আর দূরের পাহাড়, আর যার উপর দিয়ে ঘুর্ণির মতোই বয়ে যাচ্ছে চিরকালীন রাতের আকাশ। এই ক্যানভাসের প্রতিটি স্ট্রোক তার মুখস্থ বলেই, ছবিটা দেখে নতুন করে কোনও বিস্ময় জাগল না ঋত্বিকের মনে। কেবল অবাক লাগল এই ভেবে যে সত্যিই সে একদিন কলকাতা থেকে এতদূরের একটা শহরে এই ছবিটার সামনে এসে দাঁড়াতে পেরেছে। মনে-মনে আরও একবার শর্মিলার প্রতি সব কৃতজ্ঞতা উজাড় করে দিল সে।

ছবিটার সামনে সে দাঁড়িয়ে আছে পাঁচ মিনিট। ছবিটার সামনে সে দাঁড়িয়ে আছে গোটা এই সাঁইত্রিশ বছরের জীবন। ছবিটার সামনে সে দাঁড়িয়ে আছে সময়ের শুরু থেকে সময়ের শেষ পর্যন্ত। বা তারও বেশি। অনন্তকাল। চারপাশের ভিড় কখন খালি হয়ে এসেছে, আলোগুলো হয়ে এসেছে নিভু-নিভু, এমনকী সেই সুট পরিহিত গোমড়া পাহারাদারও কখন চলে গিয়েছে এই ঘর থেকে, ঋত্বিক তা খেয়ালই করেনি কারণ ছবিটার দিকে তাকিয়ে থাকতে-থাকতে, তাকিয়ে থাকতে-থাকতে, তার কেবলই মনে পড়ে যাচ্ছিল ছবিকাকুর সঙ্গে কাটানো সেইসব দুপুরগুলোর কথা যখন ছবিকাকু তাকে বইয়ের পাতায় এই ছবিটা দেখাতেন আর তার মধ্যে প্রত্যয় জাগানোর চেষ্টা করতেন এই বলে যে, তিনি না পারুন, ঋত্বিক অন্তত পারবেই একদিন এই ক্যানভাসের সামনে গিয়ে দাঁড়াতে। ইস্‌স, যদি ছবিকাকু আজ বেঁচে থাকতেন! যদি তাঁকেও নিয়ে আজ আসা যেত এখানে! কিংবা নিদেনপক্ষে কলকাতায় ফিরে গিয়ে তাঁকে যদি গল্প করে শোনানো যেত! কী খুশিই না হতেন তিনি।

ঋত্বিক এবার খেয়াল করল, গোটা ঘরটা অন্ধকার, কেবল দ্য স্টারি নাইটের ফ্রেমের উপরকার স্পট লাইটটা জ্বলছে। বাকি দেওয়ালগুলো তাই দেখাও যাচ্ছে না, যেখানে ভিনসেন্ট আর পল-এর অন্যান্য বেশ কিছু নামী ছবি টাঙানো রয়েছে। সে আরও খেয়াল করল, সে ছাড়া এই ঘরে মাত্র একজন মানুষ আছে। পুরুষ। আর সেই পুরুষ আস্তে-আস্তে এসে দাঁড়িয়েছে স্টারি নাইটের দিকে মুখ করেই, তার বাঁ হাত ঘেঁষে। সে না-তাকিয়েও দেখতে পাচ্ছে পুরুষটির শরীর, যাতে পরানো আছে সেনার উর্দি, মেডেল, কাঁধঝালর আর পালক-বসানো টুপি। কেবল সেই উর্দির বুক আর পেটের মাঝখানে, পাঁজর ঘেঁষে একটা ফুটো। অন্ধকার।

"তুই আমার উত্তরটার জন্য অপেক্ষা করতে পারলি না?"

থমথমে ঘরটার মধ্যে নিজের গলার স্বর কেমন অচেনা ঠেকল ঋত্বিকের, যখন সে নিজেকে এমন একটা প্রশ্ন করতে শুনল, পাশে এসে দাঁড়ানো পুরুষটির উদ্দেশে।

"পারতাম হয়তো, কে জানে।"

"আমি জানি। তুই পারতিস। তা হলে অপেক্ষা করলি না কেন বল?"

"সব কিছু নিজের হাতে থাকে না দাদা। সেটাও তুই জানিস।"

"অনেক কিছু থাকে না, মানছি। তাই বলে... তুই দুম করে এরকম একটা রাস্তা বেছে নিবি? তোর আমার কথা একবারও মনে এল না? মা-র কথা?"

"কী করে জানলি ঠিক কী হয়েছিল? আমাকে দোষ দিচ্ছিস যে?"

"দোষ দেব না? হ্যাঁ? দেব না দোষ? আমাদের কাছে যখন খবর এল, কোনও ডিটেল বলা হয়নি। জাস্ট বলা হল অ্যাক্সিডেন্ট। মাকে নিয়ে ছুটলাম। গিয়ে দেখলাম বুলেট শট। কী করে হয়েছে, জিগ্যেস করতে তোর ওখানকার অফিসাররা বললেন, পিস্তলের ভিতর বুলেট ছিল, পরিষ্কার করার সময় সেটাই বেরিয়ে এসে বুকের নীচে লাগে। তখন আমাদের কথা বলার অবস্থা নেই, মা প্রায় চোক্‌ড, আমরা যে তর্ক করব সেটুকু শক্তিও নেই। কিন্তু আমি তো জানি তুই এতটা কেয়ারলেস নোস। হতে পারিস না। যে মানুষ লেখার টেবিলে একটা অতিরিক্ত জিনিস দেখলে ঠিক জায়গায় গিয়ে রেখে আসত বরাবর, সে ভরতি ম্যাগাজিন নিয়ে পিস্তল পরিষ্কার করবে? নিজের দিকে তাক করে? এটা আমাকে বিশ্বাস করতে বলিস?"

"আমি তো কিছু বলছি না দাদা, তুই নিজে বলছিস। ইচ্ছে না হলে করিস না বিশ্বাস।"

"করছি না-ই তো। আমি ডেফিনিট, তুই নিজেকে শেষ করেছিস। ইউ কমিটেড সুইসাইড। তুই তো পালানোর লোক ছিলি না ভাই। তা হলে? কী সমস্যা হয়েছিল, আমাকে বলতে পারতিস। আমি ঠিক তার আগের দিন রাত জেগে তোকে চিঠি লিখেছি। জানিস?"

"এখন জানি রে। এখন সবই জানি। আমার কোনও রিগ্রেট নেই। অভিযোগও নেই।"

"তার মানে তুই মেনে নিচ্ছিস যে ওটা দুর্ঘটনা নয়? আত্মহত্যা? তুই জেনেবুঝে একটা লোডেড পিস্তল নিয়ে..."

"আমার কিছু মনে নেই রে দাদা। এখন আর মনে নেই ঠিক কী হয়েছিল। আর মনে থেকে লাভও নেই। তুই এত কিছু মনে করে রেখেছিস কেন? এই করেই তোর শরীরটা খারাপ হচ্ছে। চেহারাটাও কেমন বসে গিয়েছে।"

"এবার ঠাঁটিয়ে একটা চড় মারব কিন্তু ভাই। ইয়ার্কি হচ্ছে? মনে রেখেছিস কেন! তুই জানিস তারপর থেকে মা আর আমার সঙ্গে কথা বলে না? একদিনও না? কারণ মা মনে করে তোর মৃত্যুর জন্য আমি দায়ী? জানিস তুই? মা-র কথা বাদ দে। আমি নিজেই তো তাই মনে করি। মনে করি, আর তোর ওই মর্গে শুইয়ে রাখা লাশটা, যেটা দেখে তোকে

আইডেন্টিফাই করতে হয়েছিল আমায়, সেটা কাঁধে নিয়ে ঘুরি, খাই, স্নান করি, অফিস যাই, ঘুমোতে আসি। চব্বিশ ঘণ্টা তোর বডি, ডেডবডি আমার কাঁধে চেপে আছে। জানিস তুই? কাওয়ার্ড একটা।"

"বেশ, আর কী বলবার আছে বলে নে তুই, আমি শুনছি।"

"শুনতে তোকে এমনিতেই হবে। শুনবি না মানে? হ্যাঁ, আই ওয়জ় রং। ওভাবে হুট করে না বলে পুরী চলে যাওয়াটা আমার উচিত হয়নি। ছোট ছিলাম, ভুল হয়ে গিয়েছে ভাই। তোরও হয়তো ভুল হয়েছিল সেই গড়পঞ্চকোটের রাতে। হয়নি? আর আমার ভুল হয়েছিল ঘটনাটা দেখে ফেলা। ছোট্ট একটা ঘটনা, যা কিনা যে-কারও জীবনেই ঘটতে পারে, সেইটা নিয়ে খামোকা আমি ভাবতে বসলাম। কারণ আমি তো তোকে ভালবাসতাম ভাই।"

"জানি রে। সবটাই জানি। কেবল তুই যেটা জানিস না, সেইটা তোকে বলতে এলাম। সেটা হল এই যে, সেদিন রাতে... দ্যাখ আমি জানি যে এখন আমাদের কারও কাছেই আর ঘটনাটার কোনও মানে নেই, তা-ও বলছি, সেদিন রাতে আমার শরীর সুদক্ষিণার শরীরকে হাতড়াচ্ছিল, আর সুদক্ষিণা সেটা জাস্ট অ্যালাউ করছিল।"

"মানে?"

"মানে ব্যাপারটার মধ্যে মিনিমাম আদর তো দূর, কোথাও ভালবাসাও ছিল না। জাস্ট একটা রাগ ছিল। প্রচণ্ড রাগ, যা আমি তোকেও বলতে পারিনি।"

"কীসের রাগ? কার উপর রাগ?"

"ধরে নে নিজের উপরেই। স্কুলে থাকতেই ডরোথিকে ভালবাসতাম, জানিস তুই? কিন্তু ওদের বাড়িতে হিন্দু ছেলে মেনে নেবে না বলে হুট করে একদিন আমার সঙ্গে দেখা করা, কথা বলা, চিঠির উত্তর দেওয়া, সব বন্ধ করে দিল। রাস্তায় দেখা হলে এমনভাবে পাশ দিয়ে চলে যেত, যেন কোনও দিন দেখেইনি আমাকে। আমার মনে হত একদিন ওর বাড়িতে ঢুকে ওকে জাপটে ধরে... জানি, নট দ্য রাইট ওয়ে... কিন্তু ওটাই তখন আমার আউটলেট ছিল। অ্যান্ড ইভেনচুয়ালি ইট হ্যাপেন্ড বিটুইন আস। মানে আমি আর সুদক্ষিণা। ও কিন্তু ছাদে একলাই দাঁড়িয়েছিল দাদা। বাইরের দিকে মুখ করে হেলান দিয়ে কী একটা গান গাইছিল। ওই রাতের ছাদে গানটা তাড়া করে উঠে ওকে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখে আমি পাগল হয়ে যাই, বিশ্বাস কর! হঠাৎ মনে হয় পিছন ফিরে ডরোথি দাঁড়িয়ে আছে। আমি ওকে জাপটে ধরে পিষে ফেলতে থাকি। আদর করিনি, আক্রমণই করেছি। প্রথমটায় বাধা দেওয়ার অনেক চেষ্টা করেছিল সুদক্ষিণা। পারেনি। তারপর আমার অবস্থা দেখে আর চায়ওনি বাধা দিতে। আমাকে যা ইচ্ছে তাই করতে দিয়েছে। আমি কিন্তু মুখে

ডরোথির নাম ধরেই ডাকছিলাম। তাই সুদক্ষিণা গোড়া থেকেই জানত, ইট ওয়জ় নট হার। ইন ফ্যাক্ট, শেষের দিকে ও-ও অন্য একটা ছেলের নাম ধরে আমাকে কামড়াতে থাকে। শি ওয়জ় ব্রোকেন টু। ওর প্রেমটাও ভেঙে গিয়েছিল। বাট বিলিভ মি দাদা, ওই রাতের পর কোনও ভাবে আমার আর সুদক্ষিণার মধ্যে যোগাযোগ হয়নি। কারণ সেদিন ওটা আমরা ছিলাম না। সুদক্ষিণার প্রেমিক আর ডরোথি ছিলাম। যারা আজও পরস্পরকে চেনে না। বুঝলি?"

স্টারি নাইটের উপর আলোটাও এবার কমে আসছে, যেমন কমে আসছে ঋত্বিকের শরীরের শীতলতা। ঘাম দিচ্ছে তার, সেইসঙ্গে ছুটে আসছে জ্বর। সাইপ্রেসটা অল্প-অল্প দুলছে শীতকালের জোরদার হাওয়ার ধাক্কায়, সে এই ফ্রেমের বাইরে দাঁড়িয়েও টের পাচ্ছে। সে কেবল অস্ফুটে নিজেকেই একবার বলে উঠতে শুনল, "তুই কিছু মনে রাখিস না ভাই। আমি সব ভুলে গিয়েছি। অন্তত ভুলতে চেষ্টা করেছি। তোকে ছাড়া।"

"আমি জানি।"

"আমাকে ক্ষমা করে দিস তুই।"

উর্দি পরিহিত পুরুষের শরীরটা শ্লথ হাঁটার মধ্যে দিয়ে দেওয়ালের ওদিকে চলে যেতে-যেতে কেবল বলল, "শোন, গড়পঞ্চকোটে পাহাড়ের ঢালে ঠিক যেখানে মাউথঅর্গ্যানটা পুঁতে রেখে এসেছিলি, সেখানে একটা গাছ হয়েছে এখন। কখনও যদি যাস, তার গায়ে কান পাতলে বাজনা শুনতে পাবি। আমার।"

শরীরটা মিলিয়ে যেতেই ঋত্বিক টাল সামলাতে না পেরে মেঝেয় পড়ে গেল। কেবল এইটুকু তার মনে আছে, সে ভিড় ঠেলে এগিয়ে আসতে দেখছিল ত্রস্ত শর্মিলাকে। তারপর ঠান্ডা হাওয়ায় তার ঘুম পেয়ে যায়।

২২

ওভের-স্যুর-ওয়াজ়, ফ্রান্স
২৮ জুন, ১৮৯০

"শুনেছ? সেই পাগল আঁকিয়ে লোকটা নাকি এখানেই থাকছে আজকাল!"

"আঁকিয়ে? কোন আঁকিয়ে?"

"আহা, কিছুই কি খবর রাখো না তুমি? সেই যে কান কেটে ফেলেছিল নিজের? মোটেই সে সুবিধের লোক নয়। ক্যানভাস কাঁধে এদিক-ওদিক ঘোরে ভর দুপুরবেলা, দেখোনি?"

"ও মা, সে কী কথা! আমার চোখে পড়েনি। তা থাকছে কোথায়?"

"ওই তো, মোড়ের মাথায়, র‍্যাভো ইন-এর চিলেকোঠায়।"

"কী সাংঘাতিক ব্যাপার! ওইরকম একটা লোককে ওখানে থাকতে দিল? যদি কোনও বিপদ-আপদ ঘটায়?"

"কী জানি বাপু। দু'-একবার দেখেছি হেঁটে যেতে, চোখের দৃষ্টি দেখলে মনে হবে ভূতে পাওয়া। কোনদিন কিছু একটা ঘটিয়ে সে বসবেই, এই আমি বলে রাখলাম।"

প্রায় মাসখানেক আগের এক বিকেলে, র‍্যাভো ইন থেকে ৫০০ গজ দূরে, জলের ধারে সাঁকোর উপর দাঁড়িয়ে এমনই সংলাপ বিনিময় হয়েছিল বুড়ি এমিলি আর লরার। কারণ খবরটা শেষমেশ চেপে রাখা যায়নি যে, সেটা খোদ ভিনসেন্টও টের পেয়েছিলেন। মানুষের অতীত তার পিছন-পিছন ভূতের মতো হেঁটে বেড়ায়, কথাটা আগেও বিশ্বাস করতেন তিনি, এখনও করেন। বিশেষত কারও অতীত যদি তাঁর মতো জটপাকানো আর অন্ধকার হয়।

অ্যাডেলিনের বাবার কানেও কি উঠেছে কথাগুলো? তা হলে ভিনসেন্টের দিন গোনার পালা শুরু হয়ে যাবে। এমন লোকজনকে শান্ত এলাকায় পছন্দ করেন না কেউই। বিশেষত একজন মানুষ যখন বেশ রমরমে একখানা রেস্তোরাঁ চালিয়ে থাকেন। তবে এখনও সেরকম কোনও আঁচ পাননি ভিনসেন্ট। মালিক ভদ্রলোক উলটে বরং তাঁর প্রতি যেন একটু বেশিই সদয়। তাঁর স্ত্রীও যত্ন-আত্তির কসুর রাখেননি কোনও। দু'বেলা ভালই খাবার-দাবার পাচ্ছেন, আর সেসব একদিনের জন্যও না খেয়ে ফিরিয়ে দেননি ভিনসেন্ট। খাবারের মর্যাদা

করতে তিনি বরাবরই জানেন। এর মধ্যেই তিন-তিন বার দস্যি অ্যাডেলিনকে সামনে বসিয়ে পোর্ট্রেট এঁকেছেন ভিনসেন্ট। ভারী নিষ্পাপ একটি মুখ তার। কিন্তু সে শান্ত হয়ে বসলে তো! কখনও নানা কথায় ভুলিয়ে, আবার কখনও বা বকুনি দিয়ে তাকে বসিয়ে রেখে তবে আঁকতে হয়েছে। আর তখনই, কথায়-কথায় জেনেছেন ভিনসেন্ট, অ্যাডেলিনের বাবা-মা তাঁদের নতুন ভাড়াটে নিয়ে বেশ সন্তুষ্টই আছেন। এই জানাটুকু ভিনসেন্টকে অনেকখানি স্বস্তি দিয়েছে।

এই এক মাসে পাড়ার গুঞ্জন অনেকটাই কমে এসেছে, এখন স্থানীয় বাসিন্দাদের বেশ কয়েকজন তাঁকে রাস্তায় দেখতে পেলে অভিবাদন জানান, কুশল বিনিময় করতে চান। ভিনসেন্টেরও মন্দ লাগে না একজন মানুষের প্রাপ্য সাধারণ সম্মানটুকু নিয়ে বেঁচে থাকতে। ছবির প্রদর্শনীর আশা অবশ্য তিনি ছেড়েই দিয়েছেন একরকম।

তবে হ্যাঁ, গত একমাসে বোধহয় সংখ্যায় সবচেয়ে বেশি ছবি আঁকা হয়েছে তাঁর। মানে, এর আগে এক মাসে এতগুলো ক্যানভাস শেষ করেননি। কী যে হয়েছে তাঁর, নিজেও বুঝতে পারছেন না। কেবল ভূতগ্রস্তের মতো এঁকেই চলেছেন নানা ছবি। দিনে তিনটে ক্যানভাস পুরোপুরি শেষ করেছেন, এমনও হয়েছে বেশ কয়েকবার। গুনে দেখতে গেলে সত্তরের বেশি ছবি এঁকে ফেলেছেন এই তিরিশ দিনে। কিছু পাঠিয়ে দিয়েছেন প্যারিসে, থিওর কাছে। বাকিরা তাঁর চিলেকোঠার ঘরে জায়গা দখল করে পড়ে আছে।

আসলে, ভেবে দেখেছেন ভিনসেন্ট, গুণ এই জায়গাটারই। তাঁর নয়। জায়গাটাই তাঁকে দিয়ে আঁকিয়ে নিচ্ছে। এই সাঁইত্রিশ বছরের পাগলাটে জীবন তাঁকে নিয়ে ঘুরেছে নানা জায়গায়, কিন্তু এরকম তিনি আগে পাননি। এই শান্ত শহরতলি, যার কোথাও এগিয়ে যাওয়ার একফোঁটা তাড়াও যেন নেই... আর সৌন্দর্য এমন যে দাঁড়িয়ে গেলেই ক্যানভাসের ফ্রেম দেখতে পাওয়া যায়।

অনেকগুলি ছবি, যা নাকি তিনি এখানে আসার পর আঁকতে পেরেছেন, তাদের মধ্যে দুটি ভারী মনে ধরেছে ভিনসেন্টের। নিজের আঁকা বেশ ভাল ছবি বলেই তিনি মনে-মনে ভাবছেন এখন তাদের। র‍্যাভো ইন থেকে বেরিয়ে সোজা বাঁয়ে হেঁটে গিয়েই রাস্তা হয়ে যাচ্ছে তিন ভাগ। তাদের মধ্যে বাঁয়ের রাস্তাখানা বেশ সরু হয়ে উঠে যাচ্ছে উপর দিকে, খানিকটা যেন এঁকেবেঁকেই। একটু ওঠার পরেই আবার দু'ভাগ। সেখান থেকে বাঁয়ে গেলে কয়েক ঘর মানুষের শান্ত বসতি, যেসব বাড়িঘর থেকে খুব কমই কথাবার্তার আওয়াজ পাওয়া যায়। আর ডাইনের রাস্তা ধরে বেশ খানিকটা উঠে যেতে পারলেই একটা পুরনো গির্জা। বেশ পুরনো হলেও, এখনও ঝকঝকে আছে সে। তার দেওয়ালের গায়ে নীল-নীল কাচের বড়-বড় জাফরি, আর ইয়া পেল্লায় কাঠের দরজায় নানা কারুকাজ। গির্জা অনেকই

দেখেছেন ভিনসেন্ট, কিন্তু শহুরে জাঁকজমকের গির্জা তাঁকে কোনও দিনই টানেনি। বরং এই কয়েকঘর মানুষের প্রার্থনা নেয় যে ছোট্ট গির্জা, ভিনসেন্টের কাছে তার সৌন্দর্যই আলাদা।

জুন মাস, তাই বৃষ্টি লেগেই আছে এদিক-ওদিক। তারই ফাঁকে-ফাঁকে উঠে পড়ছে পাহারাদার রোদ। এই রকমই এক চড়া আর ঝলমলে রোদ্দুরের দিনকেই ভিনসেন্ট বেছে নিয়েছিলেন গির্জার ছবি এঁকে ফেলার জন্য। ভাগ্যিস দিনটা রোববার নয়, নইলে লোকজনের আনাগোনায় ক্যানভাস বসিয়ে কাজ করতে ভারী অসুবিধেই হত তাঁর। আকাশ সেদিন হয়ে ছিল ঘন এক নীল, আর বাতাসে মাটির হালকা নরম গন্ধ। এর চেয়ে ভাল দিন আর কী-ই বা হতে পারে? আঁকার ঠিক মাঝপথে নীচ থেকে বাঁকা মাটির পথ ধরে গির্জার দিকে হেঁটে যাচ্ছিলেন এখানকারই পড়শি, মাদাম আইরিন।

"কেমন আছেন মসিয়েঁ ভিনসেন্ট? খবর ভাল তো সব?"

বলে, উত্তরের অপেক্ষা না করেই তিনি মিলিয়ে গেলেন গির্জার অপরদিকে। কিন্তু ধরা পড়ে গেলেন ভিনসেন্টের ক্যানভাসে। ওই তো, ছবির মধ্যে, তেলরঙের আঁচড়ে, গির্জার পাশ বেয়ে উঠে যাচ্ছেন মাদাম আইরিন। এই ক্যানভাসও দিব্যি বলে দিচ্ছে, হাতে তাঁর অনেক কাজ, দাঁড়িয়ে বাজে বকার সময় নেই একেবারেই।

এই গেল একখানা ছবি। আর একখানা এরই আশে-পাশে আঁকা। গির্জা ছাড়িয়ে সোজা আর একটু উঠে গিয়ে বাঁয়ে বাঁকলেই দেখতে পাওয়া যায় বিস্তীর্ণ গমখেত আর আকাশ। দূরে-দূরে গাছের সারি, আর রোদ পোহানো গমখেত। অথচ, তার চার-পাঁচ গজ দূর থেকেও বোঝার উপায় নেই যে আর একটু এগোলেই এমন খুলে যাবে প্রকৃতির চেহারা। প্রথম যেবার হাঁটতে-হাঁটতে আবিষ্কার করলেন এই উন্মুক্ত প্রান্তর, সেদিন বিস্ময়ের ঘোর কাটিয়ে ওঠার পরেই ঠিক করেছিলেন, এই গমখেত তিনি ধরে রাখবেন ক্যানভাসে। ডানদিকে অনেকটা পেরোলে পাঁচিল দিয়ে ঘেরা একখানা এলাকা। সেদিন হাঁটতে-হাঁটতে সেখানেও গিয়েছিলেন ভিনসেন্ট। খুরপি হাতে এক মালি গাছ পুঁততে ব্যস্ত। কবরখানার গাছ। ছড়িয়ে-ছিটিয়ে অনেকখানি এলাকা জুড়ে ঘুমিয়ে আছে মৃত মানুষের দল। কারও মাথার কাছে ক্রুশ তো কারও পায়ের কাছে পাথরের পরি। তারই মাঝে-মাঝে ভারী যত্নে সাজানো ফুলের বাগান।

"নতুন নাকি এখানে? আগে তো দেখিনি আপনাকে?"

"এই মাসখানেক হল। এদিকটায় আগে আসা হয়নি। বহু পুরনো কবরখানা বুঝি?"

"হ্যাঁ, তা বলতে পারেন পুরনো। আমার বাবাও এই কবরখানাতেই কাজ করতেন। সব কাজ একা হাতে সামলাতেন। এখন অবশ্য আমি আর ভাই সামলাই। ও পাথরের কাজ করে।"

ভর দুপুরবেলায় কবরখানা ঘুরে-ঘুরে দেখছিলেন ভিনসেন্ট। প্যারিসে বার দুয়েক তিনি মঁপারনাস কবরখানায় গিয়েছেন বই কী, কিন্তু সে এক এলাহি ব্যাপার। রাস্তা হারালে খুঁজে পাওয়া দায়। তার থেকেও বড় কথা, কত-না বিখ্যাত মানুষের কবর আছে সেখানে! লোকজন ভিড় করে দেখতে অবধি আসে। এখানে কোনও চেনা মুখের, বিখ্যাত মানুষের কবর নেই। শান্তি আছে।

আজও স্পষ্ট মনে আছে ভিনসেন্টের, খুব গরমের দুপুরবেলায় ঝাঁ-ঝাঁ রোদ মাথায় নিয়েই যখন তিনি এঁকে চলেছেন সেই বিস্তীর্ণ গমখেতের ছবি, হঠাৎ এক ঝাঁক কাক ডাকতে-ডাকতে উড়তে থাকল চারপাশটায়। এমনটা হওয়ার কথা নয় যদিও, কিন্তু কোনও কারণে হয়তো তারা ভয় পেয়ে থাকবে, সেটাই মনে হল ভিনসেন্টের। আর এই আকস্মিককেও তিনি ধরে রাখলেন তাঁর তেলরঙের ক্যানভাসটিতে। সোনালি উজ্জ্বল দুপুরের গমখেতের উপর উড়ে বেড়াচ্ছে এক দল কাক, তার পরেই ঘন নীল আকাশ, যা ওভের-স্যুর-ওয়াজ়ই তাঁকে উপহার দিতে পেরেছে।

আজ কিন্তু সকাল থেকেই ভারী অস্থির লাগছে তাঁর। আর সেই অস্থিরতা তাঁকে টেনে নিয়ে যাচ্ছে এক অজানার দিকে। সেই অজানা আসলে ভয়, না আনন্দ, তিনি বুঝতে পারছেন না। কেবল আঁকতে-আঁকতে, রোদ ঢুকে আসা প্রিয় চিলেকোঠার ঘরে আঁকতে-আঁকতে তাঁর মন-মাথা-কান-চোখ সব একসঙ্গে কেন কে জানে শিরশির করে উঠছে।

আজ তিনি আঁকছেন গাছের গুঁড়ি আর মাটির নীচে বইতে থাকা তাদের পোক্ত শেকড়ের ছবি। বরাবরই মাটির সঙ্গে শেকড়ের বন্ধন আঁকতে চেয়েছেন ভিনসেন্ট, তাঁর কাছে যার চাইতে বড় সত্যি সম্পর্ক আর কিছুই নেই। কিন্তু আজ সেই ছবিটায় হাত দেওয়ার পর থেকেই, গত কয়েক মাসের সুস্থ হয়ে যাওয়া ভিনসেন্টকে আর দেখতে পাচ্ছেন না তিনি। বরং অন্য একটা মানুষকে দেখছেন যেন দেওয়ালের একফালি আয়নায়।

আরও একবার আয়নার সামনে গিয়ে দাঁড়ালেন ভিনসেন্ট, আঁকা ফেলে। নাহ্, নীল চোখের, উসকোখুসকো দাড়ি আর চুলের, পাইপ মুখে বিরক্ত এই মানুষটাকে তিনি আগে দেখেননি। আজই দেখছেন প্রথম। বাইরে, তাঁর চিলেকোঠার বাইরে তখন বেশ কিছুদূর পর্যন্ত শান্ত ওভের-স্যুর-ওয়াজ়ের নিরিবিলি একখানা স্বাভাবিক দুপুর ভেসে বেড়াচ্ছে, যা কিনা হওয়ারই কথা। কিন্তু কোথাও ভারী একটা গন্ডগোল টের পাচ্ছেন ভিনসেন্ট, ভিতর-ভিতর। নাকি টের পাচ্ছে আয়নায় দেখতে পাওয়া অচেনা সেই লোকটা, আর ভিনসেন্ট বাইরে থেকে দেখছেন তাঁকে। সব গুলিয়ে যাচ্ছে একের পর এক। হঠাৎ করে অসহ্য লাগতে শুরু করছে তাঁর। আগের মতো নয়। আগের চেয়ে অনেক-অনেক বেশি অসহ্য

হয়ে উঠেছে এই ঘর, এই ক্যানভাস, এই বিছানা, দেওয়াল, এই শহরতলি, এই দিন, এই রোদ্দুর... হ্যাঁ, এই পৃথিবীও।

তুলিটা এক ঝটকায় ছুড়ে মেঝেতে ফেলে দিতেই কাঠের পাটাতনে সবুজ তেলরং ছিটকে লাগল। জলরং হলে অনেক দূর গড়াত, এ থেমে গেল সেখানেই। ভিনসেন্ট অনেকক্ষণ গুম হয়ে তাকিয়ে থাকলেন কাঠের মেঝেটার দিকে। অনেকক্ষণ। অনেক অনেক অনেক অনেক আর সত্যি অনেকক্ষণ তিনি তাকিয়ে বসে থাকলেন নির্দোষ মেঝেটার দিকে। তারপর উঠে আর একবার তাকালেন ছোট্ট আয়নাটার মধ্যে। ওই সেই লোকটা, যার জন্যে তাঁর এখন এই দশা।

বেরোতে হবে। বেরিয়ে পড়তে হবে। তাঁকে। এক্ষুনি।

দেরাজটা খুললেন তিনি।

হ্যাঁ, বেশ। এটাই হোক।

ঝড়ের গতিতে র‍্যাভো ইনের কাঠের দরজা ঠেলে বেরিয়ে পড়লেন ভিনসেন্ট।

হাঁটতে থাকলেন।

তিনি জানেন না আয়নার ওই লোকটা এখন কোথায় যাচ্ছে।

তিনি বিলক্ষণ জানেন ভিনসেন্ট কোনদিকে চলেছে এখন।

পাতিসেরির আভেন থেকে নতুন কেক নামল একটা। তার গন্ধ ভুরভুর বাতাসে।

র‍্যাভো ইন-এর ফুটপাতে আরও এক পাত্র ওয়াইন আর সসেজের প্লেট অর্ডার দিলেন দুই সম্ভ্রান্ত বয়স্ক পুরুষ, যাদের ট্রেন সেই সন্ধেবেলার আগে নয়।

গির্জার পাশ দিয়ে, কাউকে না জানিয়ে, বয়ে গেল হাওয়া। নিজের মতোই।

অ্যাডেলিন ছুটল একটা ছটফটে কাঠবেড়ালির পিছন-পিছন।

সবজি কিনে ফেরার পথে গল্প জুড়লেন দুই বুড়ি এলমা ও লরা। আজ তাঁদের বিষয় রুটি বানানোর নতুন সব পদ্ধতি।

কবরখানায় কেউ নেই। কেউ না।

একটা বিকট শব্দ শোনা গেল কিছু দূর থেকে। সকলেই নড়ে-চড়ে বসলেন।

এক ঝাঁক কাক হঠাৎই চিৎকার করতে-করতে উড়তে থাকল ওভের-স্যুর-ওয়াজের আকাশে।

উড়তেই থাকল।

আজই তাদের ওড়ার দিন।

২৩

পেন্টহাউজ় ৩, ওর‍্যাকল্ টাওয়ার, ম্যানহ্যাট্‌ন
২৪ ডিসেম্বর, ২০১৭

আজ বেরোবেই ভেবেছিল দু'জন মিলে ওরা, কিন্তু আগের দিন মোমা-তে যা হয়েছে, তারপর এই ভিড়ভাট্টার বরফিলি রাস্তায় ঋত্বিককে নিয়ে বেরোনোর সাহস দেখাল না শর্মিলা। আগে যেটা হত, এই ধরনের দৃশ্য বা অলীক কথোপকথনের মধ্যে দিয়ে গেলে ঋত্বিক কিছুটা ক্লান্ত হয়ে পড়ত ঠিকই, কিন্তু দ্রুত সামলেও উঠতে পারত। তবে ইদানীং এসব হলেই সে ভারী নিস্তেজ আর চুপচাপ হয়ে যাচ্ছে, এটা শর্মিলার চোখে পড়েছে। তার সঙ্গে যে কথা হচ্ছে না এমন নয়। যা দেখেছে, যা শুনেছে, সব তাকে খুলে বলছে না, এমনটাও নয়, কিন্তু তার পরেও ঋত্বিকের পুরোপুরি তাজা হয়ে উঠতে অনেকটাই সময় লেগে যাচ্ছে ইদানীং। হয়তো দৃশ্য আর তার ভিতরকার কথোপকথন বেশিরকম ব্যক্তিগত হয়ে উঠলে ক্লান্তিও বাড়ছে। আর সেটাই স্বাভাবিক।

গতকাল বিকেলে মোমা থেকে বেরিয়ে কোনও রকমে একটা ক্যাব ধরে অ্যাপার্টমেন্টে ফিরেই ঋত্বিককে শুইয়ে দিয়েছিল শর্মিলা। এসব সময়ে শরীরের তাপমাত্রা বেড়ে যায় ভালরকম। জ্বরের একটা ওষুধ তো ছিলই, তা ছাড়াও এই ধরনের অবস্থার জন্যে রুখসার একটা ওষুধ দিয়ে দিয়েছেন, সেটাও ঋত্বিককে খাইয়ে দিয়েছিল শর্মিলা। ঋত্বিকের ঘুমোতে বেশি দেরি হয়নি তাই। বাইরের বিশাল হলটায়, দেওয়ালের গা ঘেঁষে, কাচের দেওয়ালের ঠিক উলটোদিকে একটা বেশ নরম-সরম সোফা, সেখানেই এলিয়ে ঘুমিয়ে পড়েছিল ঋত্বিক।

কাচের দেওয়ালের বাইরে এমন একটি দৃশ্য, যা আগে কখনও দেখেনি শর্মিলা। তাদের নিজেদের শহরটাও রাতে সুন্দর দেখায়, কিন্তু তার মধ্যে এমন বিশালতা নেই। কলকাতা নেহাত ঘরোয়া একটা শহর। কিন্তু ম্যানহ্যাট্‌ন বোধহয় তা নয়। বাইরে প্রবল ঠান্ডা হাওয়া না চললে সে তখন চৌকোনা বারান্দাটায় গিয়ে দাঁড়াত নির্ঘাত, যার ওপারে অগুনতি আলোয় ঝলমল করতে-করতে দাঁড়িয়ে আছে অসংখ্য আকাশছোঁয়া বাড়ি, আর তাদের পাশে, তাদের সামনে, তাদের পিছনে আরও আরও আরও বাড়ি। অনেকখানি নীচে

তাকালে আলোকিত রাস্তায় ব্যস্ত সমস্ত লোকজন আর গাড়ির ছটফটে ঝাঁক। আর এসব কিছুর উপরে একটা অদ্ভুত আকাশ, যার রং, ওই অত রাতেও, গোলাপি আর নীল মিশিয়ে জেগে আছে। এই এত বিরাট শহরটায় ঋত্বিককে নিয়ে চলে এসে এখন একটু ভয়ই করছে তার। স্টারি নাইট দেখে, শর্মিলা আর রুখসার ভেবেছিল, আরাম পাবে ঋত্বিক। রুখসারের কথা অনুযায়ী নিউ ইয়র্কের টিকিট কেটে ফেলতে তাই মোটেই দ্বিধা করেনি শর্মিলা। কিন্তু স্টারি নাইট-ও ঋত্বিককে আর এক ব্যথার দৃশ্যের সামনে দাঁড় করাল। তা হলে কি এতদূর ছুটে আসাটা ভুলই হল একরকম?

ঋত্বিককে ঘুমোতে দেখছে তখন শর্মিলা। চুপচাপ শুয়ে নিশ্চিন্ত ঘুমোতে দেখছে। কতদিন হল ঋত্বিককে শুধু ঘুমোতেই দেখছে শর্মিলা? কতদিন সে আর ঋত্বিক ঘনিষ্ঠ হয়নি শরীরে? মনে পড়ছে না শর্মিলার। মাঝে-মধ্যে তার নিজের যে ভারী ইচ্ছে জাগে না তা নয়, এই যেমন কাচের জানলার এপারে একটা খিদে, একটা তাড়না, একটা ইচ্ছে জাগছে তার। মনে হচ্ছে ঋত্বিককে ঝাঁকিয়ে তুলে দিতে। কিন্তু সে পারছে না। এমনকী, ঋত্বিকের মনের সঙ্গেও ঘনিষ্ঠ হতে পারছে না আর। যেন একজন অপরিচিত মানুষকে সাহায্য করবে বলে তার পাশে-পাশে থাকছে। এভাবে বেশিদিন চললে তারও যে ডিপ্রেশন আসতে বাধ্য, এটা বুঝে নিতে অসুবিধে হয় না শর্মিলার।

সুতরাং কালকের ওই অদ্ভুত ক্লান্তিকর দিনের পর, ঋত্বিককে আর এক দফা ওষুধ দিয়ে, দুপুরের খাওয়া-দাওয়ার পর একাই বেরোল শর্মিলা। কিছু কেনাকাটা করার আছে রোজকার জন্য, আর সে ভেবেছে, ব্রডওয়ের দুটো টিকিট কেটে আনবে, যদি সস্তায় পায়। কাল তো বড়দিন, তারপর কোনও একদিন যদি দেখা যায় দু'জনে মিলে, যদি ঋত্বিকের তাতে একটুও স্বস্তি বোধ হয়।

শর্মিলা বেরিয়ে যাওয়ার পর অনেকক্ষণ চুপচাপ সোফাটায় বসে কাচের দেওয়ালের বাইরে হাইরাইজের ঝলমলে ঝাঁকের দিকে তাকিয়ে ছিল ঋত্বিক। কেন তাকিয়ে বসেছিল ওভাবে আর ঠিক কী সে ভাবছিল, এসব সে বুঝতে চায়নি। তারপর উঠে ঘরের মধ্যেই পায়চারি করছিল খানিকক্ষণ। কত-কত বই ঘরের এদিক-ওদিক আছে। কেবল সাজানোই নয়, ছড়িয়ে-ছিটিয়েও রয়েছে অনেক বই। মৈনাকদা-সহেলিদি সময় পেলেই বই নিয়ে বসে থাকে যে, এটা সে কলকাতাতেও খেয়াল করেছে। কত-কত দিন এত-এত বইয়ের মধ্যে দুপুর কাটায়নি সে। কত-কত দিন নতুন পুরনো পাতাদের গন্ধ নেয়নি মন ভরে, হাত বোলায়নি ছাপা অক্ষরগুলোর গায়ে। আজ তবে সারা দুপুর এমন ভাবেই কাটানো যাবে, এই ভেবে ঋত্বিক এমনিই এই বই-সেই বই হাতে তুলে নিয়ে দেখছিল। কোনও বইয়ের মলাটের পিছনের লেখা পড়ছিল, তো কোনও বইয়ের যে-কোনও পাতা খুলে দু'-চার

লাইন। এটা তার ছোটবেলার প্রিয় একটা খেলা। হঠাৎ রুমির একটা কবিতা সংগ্রহের ২৮ নম্বর পাতা খুলে সে দাঁড়িয়ে পড়ল। পড়তে-পড়তেই দাঁড়িয়ে পড়ল, যখন মাঝ আকাশের রোদ্দুর আর একটু তেরছা হয়ে কাচের দেওয়াল থেকে চুপিসারে ঢুকছে হলঘরটায়।

It is time for us to join the line
Of your madmen all chained together.
Time to be totally free and estranged.

Time to give up our souls,
To set fire to structures and run out in the streets.
Time to ferment. How else can we leave
The world-vat and go to the lip?
We must die to become true human beings.

We must turn completely upside down
Like a comb in the top of a beautiful woman's hair.

পড়ে চুপচাপ দাঁড়িয়েই থাকল ঋত্বিক, যতক্ষণ না ডোর বেল বেজে উঠল। এই প্রথম এই বাড়ির ডোর বেল শুনতে পেল ঋত্বিক। কিন্তু শর্মিলা তো চাবি নিয়েই বেরিয়েছে। দরজা খুলে দিতেই ঋত্বিক দেখল ভিনসেন্ট ভ্যান গঘ দাঁড়িয়ে আছেন। ভিনসেন্টকে তাঁর শেষ আত্মপ্রতিকৃতির মতোই দেখাচ্ছে একেবারে। নীল একটা জীর্ণ কোট পরেছেন, বাদামি ঢোলা ট্রাউজার, মাথায় শ্যাওলাটে একখানা টুপি আর ঠোঁটে গোঁজা প্রিয় পাইপটি, যা থেকে কড়া তামাকের গন্ধ বেরিয়ে এসে লাগছে ঋত্বিকের নাকে। দাড়ি আর গোঁফ ক'দিনের অযত্নে এলোমেলো আর বেশ লালচেই বলতে হবে। তবে চোখের মণিতে সেই কড়া নীল রংখানা রয়েছেই, যা তাঁর সবক'টা আত্মপ্রতিকৃতিতে সবচেয়ে আগে নজর কাড়ে।

"ভিতরে আসতে পারি কি?"

খুবই সাধারণ একটা খসখসে গলায় প্রশ্নটা করলেন ভিনসেন্ট আর ঋত্বিকও খুব স্বাভাবিক একজন বাসিন্দার মতো হাত দেখিয়ে ঘরের ভিতরে আপ্যায়ন করল সাঁইত্রিশ বছরের রুগণ শিল্পীটিকে। তিনি বসলেন এক দিকের দেওয়ালের পাশে রাখা লাল কাঠের চেয়ারটায়, যা নাকি বেশ সুন্দরই দেখতে। বাইরে তাকালেন একবার, যেখানে দুপুরের ম্যানহ্যাট্‌ন নিঃশব্দে বয়ে যাচ্ছে হু-হু করে। নিঃশব্দেই, কারণ কাচগুলো শব্দ আটকে দেয় বাইরে থেকেই। তারপর একবার তাকালেন ঋত্বিকের দিকে, যে হাসিমুখে উলটোদিকের সোফায় নিজের জায়গা করে নিয়েছে।

"আপনি এখানে?"

"তোমার সঙ্গে দেখা করতে এলাম।"

"আপনি চেনেন আমাকে?"

"নাহ্, চিনি না। কিন্তু তুমি আমাকে চেনো। সেটাই যথেষ্ট নয় কি?"

"আপনাকে কে না চেনে! কিন্তু আমি... আমি আপনাকে কল্পনা করছি আসলে, তাই না?"

"সে তো আমি বলতে পারব না। তুমি বলতে পারবে। আমি দিব্যি তোমাকে সামনে দেখতে পাচ্ছি। এটা যদি তোমার কল্পনা হয় তা হলে তাই। কিন্তু তোমার কল্পনাটাই আমার কাছে বাস্তব এখন।"

"আপনি কি খাবেন কিছু, মানে..."

"নাহ্, খিদে নেই। তুমি ব্যস্ত হোয়ো না। স্টারি নাইট দেখলে?"

"হ্যাঁ, তা দেখলাম। আমার অনেক দিনের স্বপ্ন ছিল জানেন, একবার স্টারি নাইটের সামনে দাঁড়াব।"

"আমারও অনেক দিনের স্বপ্ন।"

"কী?"

"ওই যে, কেউ-কেউ স্টারি নাইটের সামনেও দাঁড়াবে।"

"জানি। আপনার জীবিতকালে তো সেরকম..."

"এখন এই শব্দটা শুনলে আমার হাসি পায়। জীবিতকাল। আশ্চর্য। তেমন বলতে হলে আমার জীবিতকাল তো আমার মৃত্যুর পর শুরু হল, তা-ই না? যাক সেসব। কেমন লাগল ছবিটা?"

"এ আর আমি কী বলব। এখনও মনে হচ্ছে সত্যি দেখিনি হয়তো। স্বপ্ন ছিল।"

"তা হলে বুঝছ কী করে, এখন যা হচ্ছে, তা সত্যি, না স্বপ্ন?"

"মানে?"

"কিছুই না। সত্যি বা স্বপ্ন, দুটোই তো খুব সূক্ষ্ম আর আপেক্ষিক। কোন বিষয়টা কখন সত্যি আর কোনটা কখন স্বপ্ন, সেটা অত সহজে বলে দেওয়া যায় কি হে? সব সময় ব্যাখ্যার চেষ্টা না করাই তো ভাল। তা-ই না?"

"কিন্তু এই যে আপনি এলেন এখানে, এইসব তো কল্পনার মধ্যে হচ্ছে নিশ্চয়ই?"

"হয়তো। আমার সারা জীবন তো কল্পনা করেই কেটে গেল। তুমি বুঝতে পারো, এত সহজে?"

"কী বুঝতে পারি?"

"এই যে, কোনটা কল্পনা, আর কোনটা নয়? বা ধরো, কোনটা তোমার কল্পনা, আর কখন তুমি অন্যের কল্পনার ভিতরে আছ? বুঝতে পারো?"

"নাহ্... সব কেমন মিলেমিশে যায় আমার... মানে এটা বাস্তবও হতে পারে বলছেন?"

"হতেও পারে, না-ও পারে। জেনে লাভই বা কী? তবে একটা কথা ঠিক, বাস্তব আর কল্পনার মধ্যে কিন্তু কোনও বিরোধ ছিল না। এখনও নেই বলেই তো আমি মনে করি। যা তুমি চোখের সামনে দেখছ, তা অন্য কেউ দেখতে পাচ্ছে না বলেই অবাস্তব বলে জাহির করাটা কোথাকার নিয়ম বলো দেখি? অনেকের না-দেখাকে যদি মানতেই হয়, একজনের দেখতে পাওয়াকেই বা অবজ্ঞা করব কোন সাহসে? আহাম্মকদের দুনিয়ায় অবশ্য এসবই হওয়ার কথা, তা-ই না? এই ফারাকটা, বিরোধটা অনেক দিন ধরে একদল মানুষ তৈরি করেছে। যে-বাস্তবের কথা লোকে বলে, তা আসলে কল্পনাবিরোধী। বাস্তব হল কল্পনার বিরুদ্ধে দীর্ঘ এক ষড়যন্ত্র। তাকে বিশ্বাস কোরো না।"

"আমাকেও ডাক্তার দেখাতে হচ্ছে, ওষুধ খেতে হচ্ছে। নানা সময়ে নানা দৃশ্য দেখছি..."

"তাই হবে। ডাক্তার, ওষুধ, তারপর কনফাইনমেন্ট। বন্দিদশা। যেন শরীরকে বন্দি করে রাখলে মন বেরোতে পারে না। যারা চোখের সামনেকার ঘটে চলাটাই শুধু দেখতে পায়, অন্য কিছু পায় না, তারাই যে সুস্থ, এটা কে বলল? কিন্তু হ্যাঁ, তারা সংখ্যায় বেশি।"

"আমি কি তা হলে কোনও ভাবেই অসুস্থ নই?"

"মানুষ একটু বেশি কল্পনাপ্রবণ হলেই তাকে উন্মাদ বলে দাগিয়ে দেওয়া হয়েছে চিরকাল! এতে অবাক হওয়ার বা কষ্ট পাওয়ার কিছু নেই হে। একদল মানুষ চিরকাল কল্পনাপ্রবণ মানুষকে অসুস্থ আর উন্মাদ হিসেবে চিহ্নিত করে তাকে নির্মমতার মধ্যে ঠেলে দিয়েছে, যাতে সেই মানুষের অনবদ্য কল্পনা সেসব কথা টেনে না আনে, যা শুনতে পেলে গুছিয়ে নেওয়া জীবনগুলো এক নিমেষে ভেস্তে যায়। তাই তাদের একঘরে করে দেওয়া হয়েছে সেই কবে থেকে। বেঁধে রাখা হয়েছে দিনের পর দিন অন্ধ ঘরের মধ্যে, কখনও দিগ্বিদিকহীন জাহাজে তুলে দিয়ে ছেড়ে দিয়ে আসা হয়েছে মাঝসমুদ্রে। জানো তো এটা? তারপর সেই মানুষভরতি জাহাজ ভাসতে-ভাসতে কোথায় গিয়ে ঠেকেছে কেউ খবরও রাখেনি। তুমি এখনও সেই স্তরে পৌঁছোওনি, তাই বুঝবে না। উন্মাদনা, যা কিনা সার্থক সৃষ্টির গোড়ার কথা, সেটা সাধারণ মানুষ বুঝবে, এ আশা করাও কিন্তু ঠিক নয়। ঝড়কে হয়তো কোনওদিনই সমুদ্র বোঝেনি। কিন্তু ঝড় ছাড়া তার জলে ওরকম ঢেউ তোলার আর কেউ কি ছিল? ছিল না। সুতরাং, ভেবে লাভ নেই। উন্মাদনা, তার ওই আশ্চর্য আগুন,

সাধারণের কাছে অসুস্থতাই। কিন্তু ভাবো তো, উন্মাদনা ছাড়া কল্পনার সেই স্তরে মানুষ পৌঁছোত কোত্থেকে?”

“তা ঠিক। কিন্তু এই গুলিয়ে যাওয়াটা...”

“এটা একটা সাময়িক স্তর। যেখান থেকে বেরোতে হলে তোমাকে বেছে নিতে হবে রাস্তা। হয় তুমি কল্পনায় থাকো, নয়তো বাস্তবে ফিরে যাও। দু’দিকে থাকতে গেলে তুমি ঠিক সেই কষ্টই পাবে, যা আমি পাচ্ছিলাম।”

“আপনার অভিজ্ঞতা তো বিরল। আমি সেই তুলনায় খুবই...”

“তোমার বয়স কত এখন?”

“সাঁইত্রিশ।”

“আমারও সাঁইত্রিশ। আমি আর তুমি সমবয়সি হলাম তা হলে। তোমার অভিজ্ঞতা তোমার মতো করেই বিরল। কোনও দু’জন মানুষের অভিজ্ঞতা এক হয় না, এটা মানবে তো?”

“একটা প্রশ্ন করতে পারি?”

“নিশ্চয়ই।”

“আপনি ওভাবে নিজেকে শেষ করে দিলেন কেন? কত-কত কাজ আরও করতে পারতেন, হঠাৎ আত্মহত্যার ভাবনা এল কেন?”

“দ্যাখো, পৃথিবীর কাছে ওটা একরকম নিজেকে শেষ করে দেওয়া ঠিকই, এই যেমন এখন তুমি বলছ। কিন্তু আসলে আমার কাজ শেষ হয়ে গিয়েছিল। আমি যা-যা আঁকতে পারতাম, সেটা এঁকে ফেলেছিলাম বলেই আমার বেঁচে থাকতে অসুবিধে হচ্ছিল। নিজেকে অপ্রয়োজনীয় মনে হচ্ছিল। তখন আর বাইরের বাস্তব জীবনটা আমার দরকার হত না। কোনও ভাবেই না। এই যে ঘুরে বেড়ানো, ভাড়াবাড়িতে থাকা, দু’বেলা খাওয়া, মাঝে-মধ্যে যৌনতা... এ সবই তো কেবল বেঁচে থেকে আঁকাটা চালিয়ে যেতে হবে বলে, তা-ই না? হঠাৎ একদিন দুপুরে যদি কাজ করতে-করতেই তোমার মনে হয় যে আসলে তোমার কাজ ফুরিয়ে গিয়েছে, তখন? তখন একটা বিশ্রাম দরকার। আমার অন্তত দরকার ছিল বড্ড।”

“বিশ্রাম?”

“হ্যাঁ, বিশ্রামই তো। আমি যদি আশি বছর বয়েস অবধি বাঁচতাম, আমার আঁকার কী হাল হত আমি জানি না, কিন্তু আমার দুর্দশা যে আরওই বাড়ত, তা নিয়ে আমার কোনও সন্দেহ নেই। দিনের পর দিন মানুষকে বিব্রত করা ওই ভ্রাম্যমান আর ক্লান্ত জীবন থেকে আমার একটা ছুটির দরকার ছিল। আমি তো নিইনি ছুটি, যতদিন ক্যানভাস ভাল লাগছিল,

ততদিন সব কিছু সহ্য করে এঁকে গিয়েছি। অনেকে উলটে আমাকেও সহ্য করেছে। তাদেরও বিশ্রাম দরকার ছিল। আমার মৃত্যু আমি ভালবেসেই ডেকেছি। অভিমানে নয়। আর তা ছাড়া এই যে তোমার চারপাশে এত মানুষজন চলে-ফিরে বেড়াচ্ছেন, তাঁদের সকলেই যে জীবিত, এমনটা তো নয়। জীবিত বা মৃত, দুটো বিষয়ই আপেক্ষিক। আবার দ্যাখো, চার্লস ডিকেন্স বা এমিল জ়োলা এখনও দিব্যি জীবিত। তা হলে? সুতরাং, ওই আগেই যা বলছিলাম, জীবিতকাল কথাটা আমাকে নেহাত হাসায়। আর কিছুই না।"

"কিন্তু আপনাকে তো বাঁচানো যেত সেদিন।"

"যেত তো। ডক্টর পল গ্যাশে যখন এসে পৌঁছোন, তখন অনেকটা রক্ত বেরিয়ে গেলেও বাঁচার আশা ছিল আমার। বুক আর পেটের মাঝামাঝি, যেখানে ঢুকেছিল বুলেটটা, সেই ক্ষত আমার কাছে কিছুই ছিল না আমার মাথার ভিতরকার ক্ষতের তুলনায়। আর আমার প্রিয় ভাই থিও... আহা, সে যখন এল ছুটে, তখন তার চোখেই আমি যেন মৃত্যুযন্ত্রণা দেখতে পাচ্ছিলাম। আমি বাঁচলে আমার, তার, ডক্টর গ্যাশের, আমার বন্ধু গগ্যাঁর, সকলের যন্ত্রণা বাড়ত। আর আমি এ-ও বলেছিলাম ওদের, সে-যাত্রা বেঁচে গেলে আমি আবারও হয়তো চেষ্টা করতাম। অন্য কোনও ভাবে। আর কেউ না বুঝুক, থিও সেটা বুঝতে পেরে আমাকে শান্তিতে মরে যেতে দিয়েছিল। আমি তার কাছে কৃতজ্ঞ। আর দেখো, সে কিনা তার ছ'মাসের মধ্যেই মারা গেল। আমার না-থাকাটা মানিয়ে নিতে পারল না কিছুতেই। আমি যদিও চেয়েছিলাম জো আর ছেলেকে নিয়ে ও দীর্ঘ জীবন উপভোগ করুক... কিন্তু..."

"ওঁকে তো আপনার পাশেই..."

"হ্যাঁ, সেটুকুই যা শান্তি। ওই কবরখানার পাশেই তো আঁকতাম আমি। এখন ভাই আর আমার শরীর পাশাপাশি রাখা আছে। তার উপরে লতিয়ে উঠেছে পাতাগাছ। হাওয়া দিচ্ছে। আমাদের ছোটবেলার বিছানার মতো। জানো, আজও সেই পাতা নিয়ে আসা হয় ডক্টর গ্যাশের বাগান থেকে..."

এতক্ষণে ভিনসেন্ট আবার তাকিয়েছেন বিশাল কাচের দেওয়ালের বাইরে। হাওয়ায় ঝিরঝির করছে বরফের কুচিরা। তিনি তাকিয়ে ভাবছেন কিছু। তাঁর পাইপের আগুন কথা বলতে-বলতেই নিভে গেছে কখন, কিন্তু ঠোঁটের কোণ থেকে নামাননি তিনি সেটাকে।

"তা হলে আমি কী করব আমাকে বলে দিন। আমার তো সব গুলিয়ে যাচ্ছে। সব। আমারও ইচ্ছে করছে বিশ্রাম নিতে।"

"এটা হয়। স্টেট অফ কনফিউশন। স্টেট অফ ইলিউশন। আমার হত। কিন্তু মনে রেখো, ভ্রম আসলে এক ধরনের স্বাধীনতা, স্বাভাবিকতার ফাঁদ থেকে। ভ্রম একটা

সমান্তরাল অস্তিত্ব, একটা অন্য পৃথিবী, এই চলতি সমস্ত কিছুর বিপরীতে। ভ্রম একজন শিল্পীর বন্ধু, এটা ভুলো না।"

"কিন্তু সেই পৃথিবী আর এই পৃথিবীতে তো মিলছে না।"

"মেলার তো কথা নয় হে। মেলার কথা কি? ভ্রম একটা আলাদা মাত্রা। ডাইমেনশন। ক'টা মাত্রা বুঝতে পারো তুমি? তিনটে ছিল, আমাদের সময়ে। তারপর তো চারটে হয়েছে। যদিও আঁকার সময়, এঁকে চলার দিন-রাতগুলোয় সময়কে আলাদা বয়ে চলা একটা স্রোত বলেই মনে হত আমার, যার শুরু আর শেষ আছে। সে কথা তখন কাউকে বোঝাতে গেলে পাগল বলত। অবশ্য নতুন করে কী-ই বা বলত আর। কিন্তু সব কথা বোঝানোর সময়ও এক নয়। তার জন্যে বোঝার প্রস্তুতি লাগে। কী বেশ বলছিলাম...?"

"ওই, চারটে মাত্রা..."

"হ্যাঁ। এখন সময়কে ধরে তো চারটে মাত্রা, আমাদের এই পৃথিবীর মানুষের? কিন্তু আমার বিশ্বাস, তার বাইরেও অসংখ্য মাত্রা বা ডাইমেনশন এই ব্রহ্মাণ্ডে আছে, যা আমাদের ধরাছোঁয়ার বাইরে। পৃথিবীর ধর্ম দিয়ে যেগুলোর ব্যাখ্যা হয় না। ধরে নাও, তেমনই একটা ডাইমেনশন বা মাত্রা হল ভ্রম। ইলিউশন। আমার তো অন্তত মনে হয় এইরকম। যেখানে সম্পূর্ণ সমান্তরাল একটা অস্তিত্ব অপেক্ষা করে আছে। সবকিছুর সমান্তরাল অস্তিত্ব। তার সঙ্গে এই পৃথিবীর সাধারণ ধর্ম তো মেলার কথা নয়। তা-ই না? ধরে নাও, ইলিউশন পুরোপুরি আলাদা একটা স্পেস। সেখানে অন্য একটা তুমি অন্য একটা সময়ে অন্য একটা জীবন বাঁচছ। আর তার সঙ্গে এই পৃথিবীর তুমি মুখোমুখি হলেই ঝামেলা হচ্ছে। হওয়ারই কথা। বেশিদিন ধরে একজন মানুষের দুটো অস্তিত্ব থাকতে পারে না। একটা অস্তিত্ব তাই তোমাকে বেছে নিতে হবে। নাহলে এই সংঘাত চলতেই থাকবে যে..."

"কিন্তু আমি তো আর আপনি নই। আমি সাধারণ মানুষ একজন।"

"সাধারণ হলে আমি তোমার কাছে এসে বসতাম না। আমি সাধারণ মানুষদের বিশেষ প্রিয় মনে করিনি কখনও। বা বলা ভাল, তথাকথিত স্বাভাবিক মানুষদের।"

"তা হলে বলুন, এর থেকে বেরনোর উপায় কী?"

"বেরোনোর তো সব সময় একটাই উপায়। দরজা। সব পরিস্থিতিরই একটা না একটা দরজা থাকে। এমনকী আগ্নেয়গিরিরও থাকে। আমি একটা আগ্নেয়গিরির দরজা একবার খুঁজে পেয়েছিলাম। সেটা ঠেলে বেরোতেই শান্তি। তোমার চারপাশের মধ্যেই নিশ্চয়ই তোমার দরজাটা লুকিয়ে আছে। সেটাকে খুঁজে বের করো, দরজাটা খোলো, তারপর শান্তি।"

"এত সহজ?"

"সহজ বলিনি তো। বলেছি, আছে। শোনো, জীবন আসলে শেষমেশ গমখেত আর রোদ্দুরের গল্প। তার মধ্যেই লুকিয়ে আছে সব। রাত, খিদে, যন্ত্রণা, উন্মাদনা, পাগলামো, দারিদ্র্য, স্বাচ্ছল্য, ক্ষোভ, ব্যর্থতা, প্রেম, যৌনতা, চিৎকার, নৈঃশব্দ্য, আদর, ঘৃণা, সভ্যতা, বিষাদ, অসুখ, উৎসব... সব। লুকিয়ে আছে ওই গমখেত আর রোদ্দুরের মধ্যেই। সমস্ত সম্পর্কই গমখেত আর রোদ্দুর দিয়ে ব্যাখ্যা করা যায় শেষ পর্যন্ত। তবে, সেখানে পৌঁছোনোর পরেই একমাত্র। আমি অন্তত তেমনটাই দেখেছি।"

ঋত্বিক এরপর চুপ করে গিয়েছিল। কথাগুলো যে সে খুব বেশি বুঝছিল, এমনটাও হয়তো নয়। কোনও একটা কাচের পাল্লা একটু খোলা থাকায় ঘরের মধ্যে ঠান্ডা হাওয়ার একটা অদৃশ্য ফিনকি ঢুকছে। শীত করছে তার।

"তুমি ডিকেন্স পড়েছ?"

প্রশ্নটা করলেন ভিনসেন্ট, ওই একই ভঙ্গিতে বসে থেকে।

"খুব অল্প, কলেজে থাকতে।"

"পড়বে। বেশি করে পড়বে। অবশ্য আজকাল কেউ তেমন পড়ে না। শীত কি এ বছর একটু কম?"

এর উত্তরেও কিছু বলার নেই ঋত্বিকের। নিউ ইয়র্কের শীত নিয়ে বলছেন না প্যারিসের শীত নিয়ে, ২০১৭-র শীত না ১৮৮৯-এর শীত, তার সবটা এলোমেলো হয়ে আসছে ক্রমশ। সে ঠিক কোন সময়ের মধ্যে এই ঘরটার ভিতর বসে আছে, ঠাহর করতে পারছে না। ভ্রম। সমান্তরাল একটা অস্তিত্ব। ডাইমেনশন। সে কি এখন ভ্রমের মধ্যে? না পৃথিবীর মাত্রাগুলোর আওতায়? কাচের দেওয়ালওলা এই পঁয়ত্রিশ তলার ঘরটার সত্যি কোনও অস্তিত্ব আছে তো? এক-দু'বার ভাবতে গিয়ে মাথা ঝিমঝিম করে উঠল ঋত্বিকের।

"আজ আসি। তুমি দরজাটা খুঁজে দেখো। অন্য কেউ সেটা খুঁজে দিতে পারবে না।"

ভিনসেন্ট পাইপটা কোটের পকেটে গুঁজে উঠে পড়লেন। তারপর ধীর গতিতে হেঁটে বেরিয়ে গেলেন দরজা দিয়ে। ঋত্বিকও 'চলুন আপনাকে একটু এগিয়ে দিই' বলতে-বলতে গেল তাঁর পিছন-পিছন। একইসঙ্গে এলিভেটরে দু'জন। হিসেব করে দেখেছে ঋত্বিক, পঁয়ত্রিশ তলা থেকে গ্রাউন্ডে নামতে ৯ সেকেন্ড মতো লাগে। আর নামার সময় চোদ্দ তলার পরেই বারো তলা। এত বড় একটা শহরে কোনও অ্যাপার্টমেন্টেই থার্টিন্থ ফ্লোর নেই। তা হলে বারো-র পর চোদ্দ তলাটাই কি আসলে থার্টিন্থ ফ্লোর? সেভাবে দেখতে গেলে তো বারো-র পর সব ফ্লোরগুলোই তা হলে ইলিউশন। অলীক। অথচ মানুষ কত সহজেই না তাকে মেনে নিয়েছে। এসব ভাবতে ভাবতে যখন গ্রাউন্ডে নেমে এল ঋত্বিক,

তখন বাইরে বেশ ঠান্ডা। বিকেল হয়ে গিয়েছে। লাউঞ্জ পেরিয়ে ঘূর্ণি দরজা ঠেলে বেরিয়ে গেলেন ভিনসেন্ট, আর একবারও পিছনে না তাকিয়ে।

তাঁর পিছন-পিছন বেরিয়ে এসে ঋত্বিক দেখতে পেল, আলোর ঝালর দিয়ে সাজানো হাইরাইজ়গুলো একের পর এক আকাশছোঁয়া তুলি হয়ে যাচ্ছে, আর মাটিটা প্যালেট। ছোট তুলি, মাঝারি তুলি, বড় তুলি, মোটা, চ্যাপটা আর সরু তুলির সার বেঁধে দাঁড়িয়ে থাকা একটা ঝাঁক। বরফ উড়ছে অল্প-অল্প, দেখে মনে হচ্ছে সাদা রঙের ছিটে সব। আর মাটিতে পড়ে থাকা কাদা আর বরফ হয়ে যাচ্ছে তেল রঙের স্তূপ। সেসবের উপর দিয়ে, এই বিশাল তুলির ঘন শীতকালীন অরণ্যে, বাতাস বইতে থাকা এই রঙের জঙ্গলে হাঁটতে-হাঁটতে মিলিয়ে যাচ্ছেন ভিনসেন্ট...

২৪

পেন্টহাউজ় ৩, ওর‍্যাক্‌ল টাওয়ার, ম্যানহ্যাট্‌ন
২৫ ডিসেম্বর, ২০১৭

তার চেয়ে ভাল এই শীতকে সমস্ত কথা বলে দেওয়া
শেষবারের মতো
তার চেয়ে ভাল আর আশা না করা কোনও গাছের সাহচর্য
যা শেষবার গ্রীষ্মেও পাওয়া গেছিল ভালমতোই
শয়তানের ডানা হয় না, কান হয় কেবল।
আর সেই কানের শ্রবণ টেনে নিতে চায় তোমাকে বারবার
যেদিকে তুমি যেতে চাও, আলো ফেলে সেদিকে
এই ছদ্মবেশী শীত, এই পাতা ঝরে যাওয়া গাছ,
যাবার পথে তুমি ওদের মনে রাখো
মনে রাখতে থাকো সারাক্ষণ
কারণ
আর হয়তো দেখাই হবে না ওদের সঙ্গে তোমার।

"আজ কি একটু ভাল লাগছে তোমার?"

কফি বানিয়ে এনে যখন প্রশ্নটা করছে শর্মিলা, তখন দুপুর গড়াবে প্রায়, আর বিকেল থেকেই শহরের বাড়িতে-বাড়িতে, দোকানে-দোকানে, পথে-পথে জমজমাট হয়ে উঠবে বড়দিন। আজ জমিয়ে ঠান্ডা পড়েছে, সেইসঙ্গে বাড়িতেই দারুণ রান্না আর কেক বানানোর গোপন পরিকল্পনা করেছে শর্মিলা। সে আশা করছে, তাতে ঋত্বিকের অবসাদ একদিনের জন্য হলেও একটু কম থাকতে পারে।

"হ্যাঁ, ভালই লাগছে তো। কালকের চেয়ে অনেকটা ভাল লাগছে আজ।"

যদিও গতকাল সে যা-যা দেখেছে আর শুনেছে, তার কিছুই শর্মিলাকে বলেনি ঋত্বিক। এ কারণে নয় যে সে শর্মিলাকে চিন্তামুক্ত রাখতে চায়, বরং এ কারণেই যে সেসব ঘটনাকে

সম্পূর্ণ সত্যি বলেই বিশ্বাস করেছে আর তা একেবারে গোপন রাখারই ইচ্ছে তার।

"তা হলে বিকেলে একবার হাঁটতে বেরোই, বলো? বেশি দূর যাব না। টাইম স্কোয়্যারে জমায়েত দেখে একটু কফি খেয়ে ফিরে আসব। আলো আর গাছ দিয়ে দারুণ করে সাজায় শুনেছি। তারপর বাড়িতেই গ্র্যান্ড ডিনার। যাবে তো?"

"অফ কোর্স! খুব মজা হবে।"

অনেকদিন এরকম জোরের সঙ্গে সাড়া দেয়নি ঋত্বিক, অবাক হল শর্মিলা। ভালও লাগল তার।

"আমি স্নানটা সেরে আসি, কেমন? তারপর একসঙ্গে লাঞ্চ করা যাবে। ও কে?"

"ও কে।"

শর্মিলা রেস্টরুমে ঢুকে গেল ঝটপট। ঢুকল বটে, কিন্তু ঋত্বিক জানে, খুব তাড়াতাড়ি করলেও শর্মিলার স্নান শেষ করতে অন্ততপক্ষে আধ ঘণ্টা তো লাগেই। এই সময়টাকে কাজে লাগাতে হবে। যদিও খুব নিরেটের মতোই ভাবছে সে, কিন্তু সেই ভাবাটা যে ভুল, এটা প্রমাণের জন্যে তাকে একবার ওই দরজাটা খোঁজার চেষ্টা করতেই হবে আজ এবং এক্ষুনি।

এভাবে হাতড়ে কি পাওয়া যাবে? নাকি এই অসহ্য পরিস্থিতি, যা একরকম সেই আগ্নেয়গিরির মতোই, তা থেকে বেরোনোর দরজা লুকিয়ে আছে অন্য কোথাও? ঋত্বিক জানে না।

কিন্তু সে প্রথমে সংজ্ঞা অনুযায়ী যারা সত্যিই দরজা, তাদের পরীক্ষা করে দেখতে চায়। কে বলতে পারে, ব্যাপারটা হয়তো এতটা কঠিনও নয়।

প্রথমেই ফ্রিজের দুটো দরজা। ওপরেরটায় কাঁচা মাছ-মাংস আর বরফ, নীচেরটায় সবজি, পাঁউরুটি আর খাবারদাবার।

তারপরেই আলমারির দরজা। প্রচুর-প্রচুর জামাকাপড় আর প্রচুর-প্রচুর জামাকাপড়।

তারপরেই বুক শেলফের দরজা। বই আর বই।

তারপর শু র‍্যাক। যা ভেবেছিল তাই। সার বেঁধে শুইয়ে রাখা জুতোর দল।

তারপর রান্নাঘরের ওভারহেড র‍্যাকগুলো। মশলা, বাসনপাতি, কফি।

তারপর বেডরুমের সাইড টেবিলের ড্রয়ার তিনটে। ওষুধ, ক্লিপ, ফোনের চার্জার।

এই করে অ্যাপার্টমেন্টের সব রকমের সবক'টা দরজা চেষ্টা করে দেখল ঋত্বিক। যেখানে যা থাকার কথা সেখানে তাই আছে। নিজেকে নেহাত এক আহাম্মক আর মূর্খ বলেই মনে হতে লাগল তার। এভাবে কি পাওয়া যায় নাকি? বিরক্ত আর ক্লান্ত লাগতে

লাগল তার, যখন রেস্টরুম থেকে শাওয়ারের জলের তোড় শব্দ তৈরি করতে থাকছে লিভিং রুমে। অসহ্য। জল তো নয়, লাভা। শত্তুর। ধেয়ে আসছে তার দিকে। ছুটে আসছে। উড়িয়ে পুড়িয়ে নিয়ে যাবে বলে। অসহ্য। এই নরকের মতো অগ্নিকুণ্ড এবার ঋত্বিকের মাথার মধ্যে ঢুকে পড়তে চাইছে। তার অলিগলি তছনছ করে এগোতে চাইছে নীচের দিকে। কোন জন্মের প্রতিশোধ নিতে এসেছে এই চলন্ত আগুনের স্রোত? কোন অস্থিরতার উপহার তুলে দিতে এসেছে কাঁপা হাতে? ঋত্বিকের হাত দুটো কাঁপছে। ঠান্ডায়, উত্তাপে। লিভিং রুমের মধ্যে জলের তোড়ের ছদ্মবেশে লাভার স্রোতের আওয়াজটা থেকে পায়চারি করে-করে পালিয়ে বেড়াচ্ছে সে আর ঝাঁকাচ্ছে ভারী হয়ে আসা শীতল একটা মাথা, যার মধ্যে মুখ ডুবিয়ে, সরু ঠোঁট ডুবিয়ে, হিসহিস করে কেউ একজন বলছে, "We must die to become true human beings"। এমন ভাবে বলছে কথাটা যে অক্ষরগুলো ভেঙে গিয়ে প্রত্যেকটা শব্দের টুকরো বরফের কুচির মতো ছড়িয়ে-ছড়িয়ে নেমে আসছে তার সারা শরীরময়। শরীর কি একটা শহর? তা হলে তার শরীর এখন প্রাচীন পম্পেই শহরের মতোই একটা লাভাস্রোতের নিরুপায় অপেক্ষায় পায়চারি করছে ঘরময়। কে বলছে কথাটা? শয়তান? দেবদূত? না ভিনসেন্ট?

We must die to become true human beings.
We must die to become true human beings.
We must die to become true human beings.

আর থাকতে না পেরে এক ঝটকায় কাচের ভারী পাল্লাখানা সরিয়ে চৌকোনা খোলা বারান্দাটায় এসে রেলিং আঁকড়ে ধরে দাঁড়াল ঋত্বিক। যাক। জলের ছদ্মবেশে ওই লাভাস্রোতের এগিয়ে আসার কুৎসিত আওয়াজটা এখানে নেই। এখানে কেবল শীতের হু-হু বাতাসের শব্দ, বড়দিনের ঝলমলে ঠান্ডা হাওয়ার আওয়াজ, যা এখন ঋত্বিকের চোখমুখ চিরে দিয়ে যাচ্ছে, অথচ ঋত্বিক তা টের পাচ্ছে না। সে তাকাল নীচে। পঁয়ত্রিশ তলা থেকে মাটিতে। কী আশ্চর্য কাণ্ড! যেখানে এখন একটা ছোট্ট পার্ক, দুটো বেঞ্চ, ট্র্যাফিক বয়ে যাওয়া কালো পিচ রাস্তা আর লম্বাটে বাড়িগুলোর নীচে চৌকো-চৌকো ঝলমলে সব দোকান থাকার কথা, থাকার কথা টুনি-লাগানো বেশ কিছু ক্রিসমাস ট্রি আর রংচঙে বেলুন, সেখানে এখন সেসব কিছু নেই! বরং নীচে রাত নেমে গিয়েছে।

সেইরকমই দেখতে পেল ঋত্বিক। তাদের ৩৫ তলার বারান্দার বিকেলটা নীচে, মাটি অবধি পৌঁছোতে-পৌঁছোতে মাঝখানে কখন সন্ধে পেরিয়ে রাত হয়ে গিয়েছে। যেন সময়ের শরীর আর উচ্চতা সমানুপাতিক এই বারান্দায়। আর সেই রাতের অল্প আলোয়, পঁয়ত্রিশ

তলা নীচে, দেখা যাচ্ছে ঢালু মাঠের পর আরও ঢালু মাঠ, লম্বা আর বাঁকা-সোজা হয়ে দাঁড়িয়ে থাকা সাইপ্রেস গাছ, একটা গির্জার ঘুমন্ত চুড়ো, আর দু'-একটা ছোট বাড়িঘর। এ ছাড়া আর কিছু কোথাও নেই। যা আছে, তা কেবল রাত।

কই, মাথার ভিতর কেউ আর কোনও কথা বলছে না তো? থেমে গেল তা হলে? কিন্তু শুধু কথা কেন, কোনও আওয়াজই নেই। একটা ন্যূনতম আওয়াজও এখানে দাঁড়িয়ে পাচ্ছে না সে। বদলে, এতক্ষণ পর, আবার সেই ছুটে আসা, বুকে হেঁটে আসা হিংস্র সরীসৃপ লাভাস্রোতের আওয়াজ আসছে কানে। আসতে-আসতে চড়মড় চটাপট শব্দে সে পুড়িয়ে দিয়ে আসছে সব, পিছনে ফেরার সবক'টা রাস্তা ছাই করে দিতে-দিতে এগিয়ে আসছে তারই দিকে।

আর দেরি করা যাবে না। আর এক মুহূর্তও নয়। লাভাস্রোত এই কাচের দরজা পেরিয়ে বারান্দায় উঠে এলে তাকে কেউ বাঁচাতে পারবে না। ঋত্বিক, বারান্দার রেলিং-এ ভর দিয়ে নিজেকে ভাসিয়ে দিল নীচের দিকে, চুপচাপ, আলতো করে, কোনও রকম কষ্ট ছাড়াই।

ভাসতে-ভাসতে অনন্ত এক পঁয়ত্রিশ তলার মাথা থেকে মাটির দিকে নামতে লাগল ঋত্বিক, আর ভাসতে-ভাসতেই দেখল, সে এক নিশ্চিন্ত চিরুনির মতোই আকাশ থেকে মাটিতে নেমে যাওয়া এক ঢাল মেয়েলি চুলের মধ্যে দিয়ে ভাসতে-ভাসতে নেমে যাচ্ছে। শর্মিলার চুল কি? স্নানের সময় খুলে দেওয়া? কই, জল নেই তো তাতে! নাকি সময়ের শরীরেই এরকম সুগন্ধ থাকে? ঋত্বিক ভাসতে থাকল।

কোনও শব্দ নেই।

কোনও তাড়া নেই।

কোনও কষ্ট নেই।

এক ঢাল মেয়েলি চুলের সুগন্ধ সারা শরীরে নিতে-নিতে ভাসতে-ভাসতে যখন মাটিতে এসে পা রাখল সে, তখন সেখানে, হিসেব মতোই, বেশ গভীর রাত। কালচে সবুজ নরম ঘাসওলা ঢালু মাঠের পর মাঠ পিঠোপিঠি শুয়ে আছে, যেন এক চাদরে জড়ামড়ি করে ভাইবোন। এর পিঠ বেঁকে আছে তো ওর কোমর উঠে আছে। এরকম ঘনিষ্ঠ মাঠের দলের উপরে, বাঁদিক ঘেঁষে দুটো সাইপ্রেস গাছ। তারাও একেবারেই পিঠোপিঠি। রাতের হাওয়ায় তাদের শরীর অল্প-অল্প দুলছে, খুব ধীরে। একটু দূরে ছোট-বড় অন্যান্য গাছও চোখে পড়ছে

আবছা। কয়েকটা ছিমছাম বাড়ির পাশে একটা গির্জার ঘুমন্ত চুড়ো, কেউ নেই তার চারপাশে। গোটা দৃশ্যটা অদ্ভুত এক নীলচে আলোয় ছমছম করছে। প্রুশিয়ান ব্লু? আলট্রামারিন? না কোবাল্ট? নাহ্, এর কোনওটাই নয়। তার জানার বাইরে কোনও এক নীল রঙে ডুবে আছে এই রাত আর তার চারপাশ।

আস্তে-আস্তে এগিয়ে গেল ঋত্বিক। একটু দূরে আরও দু'-একটা বাড়ি, তাদের জানলায় হলদেটে নরম আলো জ্বলছে। এখনও ঘুমোয়নি হয়তো বাসিন্দাদের কেউ-কেউ। মাথা তুলে একবার তাকাল সে। সেই বারান্দাটা, পঁয়ত্রিশ তলার সেই বারান্দাটা, যেখান থেকে সে এসেছে এখানে, সেটা আর দেখা যাচ্ছে না এখন। বদলে রাতের আকাশ এসে ঢেকে দিয়েছে তাকে। রাতের ধীরগতিতে ঘূর্ণায়মান চিরআকাশ, যা সময়ের চেয়ে বয়সে বড়, আর যার সারা শরীরে নকশা বুনতে-বুনতে ঘুরে চলেছে কত না বিরামহীন ছোট-বড় নক্ষত্র, তাদের গা থেকে আস্তে-আস্তে ঠিকরে বেরোচ্ছে সেই আগুন, উন্মাদনার আশ্চর্য আগুন। আর একটা চাঁদও হয়তো এরই মধ্যে গোল হয়ে ঘুরপাক খাচ্ছে খুব ধীরে। তার হলদে-রুপোলি আলো এসে পড়েছে ঘুমন্ত এই উপত্যকায়। দূরে, অনেক দূরে একটা একলা গাছ, ঋত্বিকের চেনা। খুব আবছা একটা বাজনা ভেসে আসছে গাছের সারা শরীর থেকে, মাউথঅর্গ্যানের। আর ওই দূরের বাড়িগুলির একটা থেকে, তার খোলা হলদে আলোর টিমটিমে জানলা থেকে ভেসে এসে নাকে লাগছে ভারী চেনা আর পুরনো একটা গন্ধ। আলু-পেঁয়াজ ভাজির। সবে চাপানো হয়েছে। ঋত্বিকের চোখে পড়ল, একটু দূরেই মাঠের উপর পাইপ মুখে বসে আছেন ভিনসেন্ট। পাইপ কখন নিভে গিয়েছে, খেয়াল নেই তাঁর। তিনি কেবল চুপচাপ দূরের দিকে তাকিয়ে বসে আছেন কখন থেকে, কোথাও উঠে যাবার তাড়া তাঁর আর নেই। ঋত্বিক খুব ধীর পায়ে, হাঁটতে লাগল তাঁর দিকে। হাঁটতেই লাগল। কতক্ষণ ধরে, সে জানে না। কিন্তু এই তারাভরা আকাশের নীচে, রাতের ঘূর্ণনকে পায়ে বেঁধে নিয়ে ঋত্বিক হেঁটেই যেতে লাগল ভিনসেন্টের দিকে। হাঁটতে থাকল তো হাঁটতেই থাকল... রাত শেষ হতে কত দেরি, কে জানে...

ঋণ

দূর্বা বন্দ্যোপাধ্যায়
অনুত্তমা বন্দ্যোপাধ্যায়
চিন্ময় গুহ
মৌসুমী দত্তরায়
কাজল মুখোপাধ্যায়
ইন্দ্রদীপ দাশগুপ্ত
বৈতালী গঙ্গোপাধ্যায়
শুভাশিস মিত্র
Exhibition titled 'On the Verge of Insanity',
The Van Gogh Meuseum, Amsterdam
www.vangoghletters.org
The Meuseum of Modern Arts, New York

তারাভরা আকাশের নীচে • শ্রীজাত

|| ই-বুকটি সমাপ্ত হল ||

www.anandapub.in

Table of Contents

শিরোনাম পৃষ্ঠা	1
কপিরাইট পৃষ্ঠা	2
উৎসর্গ	3
আমাদের প্রকাশিত এই লেখকের অন্য গ্রন্থ	4
সূচিপত্র	6
অধ্যায়: ১	8
অধ্যায়: ২	13
অধ্যায়: ৩	18
অধ্যায়: ৪	24
অধ্যায়: ৫	29
অধ্যায়: ৬	33
অধ্যায়: ৭	37
অধ্যায়: ৮	41
অধ্যায়: ৯	46
অধ্যায়: ১০	52
অধ্যায়: ১১	57
অধ্যায়: ১২	62
অধ্যায়: ১৩	67
অধ্যায়: ১৪	73
অধ্যায়: ১৫	80
অধ্যায়: ১৬	87
অধ্যায়: ১৭	91
অধ্যায়: ১৮	97

অধ্যায়: ১৯ 102
অধ্যায়: ২০ 108
অধ্যায়: ২১ 113
অধ্যায়: ২২ 119
অধ্যায়: ২৩ 125
অধ্যায়: ২৪ 135
ঋণ 140